# বাংলাদেশের ইঞ্জিন

## দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্র

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

# বাংলাদেশের ইঞ্জিন

## দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স

স্বাধীনতা থেকে শুরু আমাদের চলা। তারপর দেশকে মুক্ত করার যুদ্ধ। আমরা থামিনি। বিজয় এনেছি। আমরা দেশকে গড়েছি। নদীকে বেঁধেছি সেতুতে, শহরকে গ্রামের সঙ্গে জুড়েছি সড়কে। কারখানার কল হয়েছে সচল, মাঠভরা ফসল। আমরা জয় করেছি দারিদ্র্যের যুদ্ধটাকে। স্বনির্ভর হয়েছি। মাঝে বন্যা এসেছে, ঝড় আঘাত হেনেছে, মহামারি থামিয়ে দিয়েছে বিশ্ব, তাতেও আমরা দমিনি। এখন স্বনির্ভরতা থেকে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। স্বাধীনতা থেকে সমৃদ্ধির পথযাত্রায় দেশের প্রকৌশলীদের অবদান স্মরণ করছি এই প্রকাশনায়। আমরা বলতে চাই, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও দেশকে সচল রাখার মূল ইঞ্জিনটা আসলে তাঁরাই।

**ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ**
ঢাকা কেন্দ্র

# উৎসর্গ

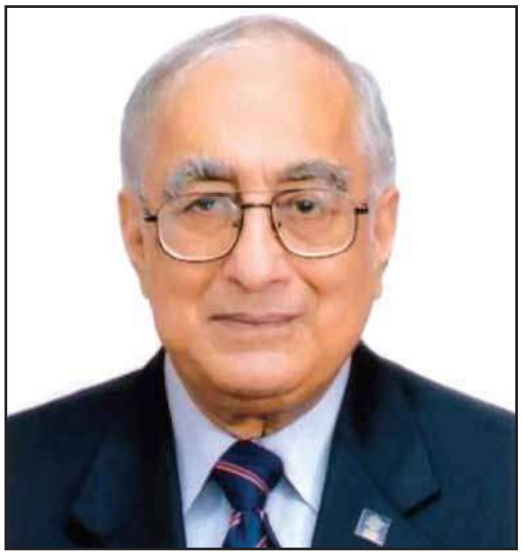

প্রকৌশল পেশার অন্যতম পুরোধা, পদ্মা বহুমুখী সেতুর প্রধান কারিগর
একুশে পদকপ্রাপ্ত জাতীয় অধ্যাপক এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ

**ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী** কে

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

# প্রধানমন্ত্রী
## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ পৌষ ১৪২৭
১৬ ডিসেম্বর ২০২০

# বাণী

আজ ১৬ ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবস। বাঙালি জাতির এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি দীর্ঘ তেইশ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। ৫০তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেইসব দেশ ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি যাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সহায়তা দিয়েছেন।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, ত্রিশ লাখ শহিদ, সম্ভ্রমহারা দুই লাখ মা-বোন এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের-কে, যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন, বাষট্টি'র শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টি'র ৬-দফা, উনসত্তরের ১১-দফা ও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানিরা বাঙালি জাতিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেয়নি। জাতির পিতা অনুধাবন করেন, স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া বাঙালি জাতির ওপর অত্যাচার, নির্যাতন ও বঞ্চনার অবসান হবে না। তাই তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। চলতে থাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুবিজনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধারা পাক হানাদার এবং তাদের দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন। আমরা পাই লাল-সবুজের পতাকা।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ হত্যা করে। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তারা হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে দেয়। মার্শাল ল' জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। স্বাধীনতাযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃত করে, ভুলণ্ঠিত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতানা। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রুদ্ধ করে। পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার এই ধারা অব্যাহত রাখে।

বর্তমান বাংলাদেশ বদলে যাওয়া এক বাংলাদেশ। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে এবং ২০০৯ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। মাথাপিছু আয় ২০০৫-০৬ সালের ৫৪৩ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২,০৬৫ মার্কিন ডলারে দাড়িয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আমরা সামষ্টিক অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং কূটনীতিসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ সড়ক-রেল-নৌ-বিমান যোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর ৫৭তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইট-প্রযুক্তির অভিজাত দেশের কাতারে যুক্ত হয়েছি। বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বের ৫টি দেশের একটি; উন্নয়নের 'রোল মডেল'। আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বাস্তবায়ন শুরু করেছি।

জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, নারী নির্যাতন ও মাদক নির্মূলে আমাদের সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছি। জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। আমরা ভারতের সঙ্গে স্থলসীমানা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমারও শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ এবং ইউনেস্কো যৌথভাবে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছে। আগামী বছর আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করবো। আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশ, গণতন্ত্র ও সরকার বিরোধী যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করি। করোনা মহামারির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি এবং দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখি। মহান বিজয় দিবসে এই হোক আমাদের সুদৃঢ় অঙ্গিকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

# বাণী

**বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক**
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
**প্রাক্তন মাননীয় প্রেসিডেন্ট**
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস-২০২০ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এ উপলক্ষে আইইবি'র সর্ববৃহৎ ঢাকা কেন্দ্রের সকল প্রকৌশলী ভাইবোনদের জানাই বিজয় দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মুজিব বর্ষের এই শুভলগ্নে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, বাঙালি জাতির রূপকার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদকে। সেই সঙ্গে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ২ লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের প্রতিভাবান প্রকৌশলীরা সব সময় প্রস্তুত। বর্তমান সরকার ঘোষিত "রূপকল্প-২০২১" ও "ভিশন-২০৪১" বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার মধ্য দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে প্রকৌশলীরাও তাদের মেধা দিয়ে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন।

স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও অন্যান্য দিক বিবেচনায় পাকিস্তান অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমানে মাথাপিছু আয়, প্রবৃদ্ধির হার, রিজার্ভসহ বিভিন্ন সূচকে পাকিস্তানকে পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। এছাড়াও শিক্ষা, প্রযুক্তিসহ সব দিক থেকে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। বিজয়ের ৫০তম বর্ষে তা সম্ভব হয়েছে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার অক্লান্ত পরিশ্রম ও তাঁর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয়-এর তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে।

অনেক প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি সঙ্গে নিয়েই করোনাকালে বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীর শুভলগ্নে বাংলাদেশ। আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টাই পারে উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতাকে টেকসই উন্নয়নে রূপান্তরিত করতে। সকলকে মহান বিজয়ের শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর**

# বাণী

**মাননীয় প্রেসিডেন্ট**
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস-২০২০ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এই স্মরণিকার মাধ্যমে আইইবি'র প্রকৌশলী ভাইবোনদের বিজয়ের ৫০তম বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আজকের এই শুভলগ্নে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, বাঙালি জাতির রূপকার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের। সেই সঙ্গে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ২ লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে। স্মরণ করছি প্রকৌশলী মরহুম আব্দুল জাব্বারসহ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যাঁরা এ প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান উন্নতিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি।

বিশ্বায়নের এই সময়ে আমি বিশ্বাস করি, জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপে প্রকৌশলীদের নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান যুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। বিশ্বায়নের এ যুগে তথ্যপ্রযুক্তি ও বিপ্লবের ঢেউ বাংলাদেশেও এসে লেগেছে। দেশের প্রকৌশলীদের পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বায়নের তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে। পরিবর্তিত বিশ্ব বাস্তবতার আলোকে এদেশের প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতার মান উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। দেশের প্রকৌশলীগণ তাদের অর্জিত মেধা ও কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের কাজের গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করবেন-এটা আমাদের প্রত্যাশা। আর এ জন্য আইইবি'র কেন্দ্রগুলোও তাদের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে আরো বেশি ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

উন্নয়নশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রেখেছে, বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১ এবং ডেল্টা-২১০০ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সকল প্রকৌশলী নিজ অবস্থান থেকে সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ঢাকা কেন্দ্রের সার্বিক কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

প্রকৌশলী মোঃ নূরুল হুদা

# বাণী

**সম্মানী সাধারণ সম্পাদক**
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ঢাকা কেন্দ্রের মহান বিজয় দিবস-২০২০ এর স্মরণিকার মাধ্যমে সকল প্রকৌশলীদের জানাই মহান বিজয় দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মুজিব শতবর্ষের এই শুভলগ্নে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, বাঙালি জাতির রূপকার সর্বকালের সবশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের। সেই সঙ্গে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ২ লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে। স্মরণ করছি প্রকৌশলী মরহুম আব্দুল জাব্বারসহ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যাঁরা এ প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান উন্নতির জন্য নেতৃত্ব দিয়েছেন, সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে এদেশের প্রকৌশলী সমাজ অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। দেশের টেকসই উন্নয়নে প্রকৌশলীদের সবচেয়ে বেশি অবদান রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। বর্তমান সরকার বিগত ১২ বছর যাবৎ দেশের ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার পদ্মা সেতু, ফ্লাইওভার, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেল, সড়ক-মহাসড়ক নির্মাণ, গভীরসমুদ্র বন্দর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ প্রকল্প, আইসিটি খাতের উন্নয়ন, তেল, গ্যাস, কয়লাসহ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণসহ আরো অনেক কাজ করে যাচ্ছে। সারা দেশে আজ উন্নয়নের যে গতিধারা চলমান, প্রকৌশলী সমাজই তার মূল চালিকাশক্তি। বর্তমান সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১' ও 'ভিশন-২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের ও উন্নত দেশে পরিণত করার মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে প্রকৌশলীরাও তাদের মেধা দিয়ে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন।

আমি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ঢাকা কেন্দ্রের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শাহাদৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ

# বাণী

**চেয়ারম্যান**
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্র

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং কাউন্সিলের পক্ষ থেকে প্রকৌশলী সমাজকে জানাচ্ছি বিজয়ের শুভেচ্ছা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী ও সাহসী নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন বাংলাদেশ। পেয়েছি লাল-সবুজের পতাকা। বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল মহান বিজয় দিবসে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ স্বাধীনতাযুদ্ধে সকল শহীদ প্রকৌশলীসহ বীর সন্তানদের।

বাংলাদেশ নামক দেশটি স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বর্তমান সরকারের আমলে আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। টেকসই অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সরকারের উন্নয়ন ভাবনা ও যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ আজকে সমগ্র বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আজ দৃষ্টান্ত। অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ নাগরিক অধিকারের প্রায় সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মডেল। বিশ্বকে চমকে দেয়ার মতো সাফল্য আছে বাংলাদেশের। বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা খাতের উন্নয়নে অনেক দূর এগিয়েছে এবং এগিয়ে যাচ্ছে। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে বর্তমানে বিভিন্ন স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। পোশাকশিল্পে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ দেশ। বর্তমানে আবাসন, জাহাজ, ওষুধ প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য, শিল্প, অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, নারী ও শিশু উন্নয়নসহ নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জ্যামিতিক গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কাজ করছে। লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের দারিদ্র্যমুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হওয়া। সেই পথ ধরে ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্নও দেখছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নে, সন্ত্রাসবাদ দমনে, জঙ্গিবাদ নির্মূলে দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃত্ব দিচ্ছে। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতোই পদক্ষেপ এগুলো। ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে হবে উন্নত, সমৃদ্ধ দেশ। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি ও সমুদ্রবক্ষে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্লু ইকোনমির নতুন দিগন্ত উন্মোচন, বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট সফল উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে মহাকাশ জয়, সাবমেরিন যুগে বাংলাদেশের প্রবেশ, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, মেট্রোরেল, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, কর্ণফুলী টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, নতুন নতুন উড়ালসেতু, মহাসড়কগুলো ফোর লেনে উন্নীত করা, প্রথমবারের মতো এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, মাথাপিছু আয় ২ হাজার ডলারে উন্নীত, প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ১ শতাংশ, দারিদ্র্যের হার হ্রাস, বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২২ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যাওয়া, ৯৪ ভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ-সুবিধার আওতায় আনা, যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন, সাক্ষরতার হার ৭৩ দশমিক ৯ শতাংশে উন্নীত করা, বছরের প্রথম দিন প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে নতুন বই পৌঁছে দেওয়া, মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা ও স্বীকৃতি দান, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ, নারীনীতি প্রণয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, ফোর-জি মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার চালুসহ অসংখ্য ক্ষেত্রে কালোত্তীর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

পরিশেষে স্মরণিকাটির সফল প্রকাশনায় যাদের সহযোগিতা ছিল, তাদের সবার প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। সকল প্রকৌশলীর উন্নতি কামনা করছি।

M. M. Abul Hossain

বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন

# বাণী

**সম্মানী সম্পাদক**
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্র

মহান বিজয় দিবসে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সকল প্রকৌশলীকে জানাই শুভেচ্ছা।

মহান বিজয় দিবসের এই আয়োজনে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদ প্রকৌশলীসহ ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সকল বীর শহীদদের ও বীরাঙ্গনা মা-বোনদের।

'যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ-যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস' সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এটি অর্জিত হতে যাচ্ছে। এটি সম্ভব হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহসী এবং অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে; যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

স্বাধীনতার ৫০ বছরের কম সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মতো সফলতা দেখিয়েছে বাংলাদেশ। জাতির পিতা সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার জন্য একতাবদ্ধ করেছিলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ থেকে জাতির পিতার ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলার দিকে এগোচ্ছে বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গসমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রফতানিমুখী শিল্পায়ন, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাকশিল্প, ওষুধ শিল্প, রফতানি আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচক বেড়েছে। বাস্তবায়িত হচ্ছে পদ্মা বহুমুখী সেতু, কর্ণফুলী টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীরসমুদ্র বন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ।

৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে জন্ম নেওয়া এই বাংলাদেশকে আজকের অবস্থানে আসতে অতিক্রম করতে হয়েছে হাজারো প্রতিবন্ধকতা। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৮টি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা, শিশুমৃত্যু হার কমানো এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষত শিক্ষা সুবিধা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার ও জন্মহার কমানো, গরিব মানুষের জন্য শৌচাগার ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান এবং শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম অন্যতম। এছাড়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে সাফল্য ঈর্ষণীয়। নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা'। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জন সাধিত হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য খাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সাফল্য ও মন্দা মোকাবেলায় বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে যাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা আর অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে এ স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

জয় বাংলা।

**প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার**

# শুভেচ্ছা বক্তব্য

**ভাইস-চেয়ারম্যান**
(একাডেমিক ও এইচআরডি)
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্র

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সকল প্রকৌশলীকে জানাই মহান বিজয় দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এই বিজয়ের মাসে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা এবং মহান স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ বীরঙ্গনাকে। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি ৭৫ এর ১৫ আগষ্ট ইতিহাসের নির্মমতম হত্যাকান্ডের শিকার বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ জাতির জনকের পরিবারের সকল শাহাদাৎ বরণকারী সদস্যকে। আজকে বিজয়ের ৫০তম বর্ষে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর কারাগারের অভ্যন্তরে নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার জাতীয় চার নেতাকে। একই সাথে স্মরণ করছি ৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে অদ্যাবধি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহীদদের। বিজয়ের এ বছর বাংলাদেশ ৫০তম বিজয় বর্ষে পদার্পন করেছে। এতটা পথ পরিক্রমায় অনেক স্বপ্নগাথা, সাফল্যগাথা রয়েছে বাংলাদেশের। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ স্থাপন, পদ্মা বহুমুখী সেতু, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কর্নফুলি টানেল, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, ঢাকা মেট্রোরেল, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পের উন্নয়নসহ বিভিন্ন প্রকল্প অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে। আজকের যে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা তা একদিনে রচিত হয়নি। এর জন্য অনেক সংকটাপন্ন পথ পাড়ি দিতে হয়েছে গণতন্ত্রের মানসকন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনাকে। বিষবৎ বিশ এ শুরু হওয়া বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অত্যন্ত সফলভাবে মোকাবেলা করছে। এ লড়াইয়ে অবকাঠামোগত সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরনের জন্য প্রকৌশলীরা অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করছে এবং অব্যাহতভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ অর্জনের দ্বারপ্রান্তে আমরা। ভিশন ২০৪১ এর মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ও ডেল্টা ২১০০ প্ল্যান বাস্তবায়নে আমরা প্রকৌশলী সমাজ কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করে যাব এই হোক এবারের মহান বিজয় দিবসের দৃপ্ত অঙ্গিকার। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে প্রকৌশলীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

স্মরণিকাটির সফল প্রকাশনায় যাদের সহযোগিতা ছিল তাদের সবার প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে সকল প্রকৌশলীর উত্তরোত্তর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং উন্নতি কামনা করছি।

**প্রকৌশলী হাবিব আহমদ হালিম (মুরাদ)**

# বক্তব্য

**ভাইস-চেয়ারম্যান**
(প্রশাসন, পিএন্ডএসডব্লিউ)
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্র

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে মহান বিজয়ের মাসে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে; এজন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং উচ্ছ্বসিত। ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন, পিএন্ডএসডব্লিউ) হিসেবে আইইবি'র সার্বিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি এবং সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর কাছে শোক্‌রিয়া আদায় করছি। সবাইকে জানাচ্ছি মহান বিজয় এবং মুজিববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বিজয়ের মাসে প্রথমেই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, বাঙালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদদের। আরও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি 'একাত্তরের ৩০ লক্ষ বীর শহীদকে এবং ২ লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে, যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। তার সঙ্গে স্মরণ করছি কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নির্মমভাবে নিহত জাতীয় ৪ নেতাসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের প্রারম্ভে দেশমাতৃকার সূর্যসন্তানদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

বৈশ্বিক মহামারি করোনার মধ্যেও মূল্যবান শ্রম, মেধা ও পেশাগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যারা 'বিজয় দিবস সংখ্যা সম্পাদনা পরিষদ'-এ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করেছেন, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান স্মরণিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মহান আল্লাহ্‌পাক সবাইকে হেফাজত করুন। সকলের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। মেহনতি মানুষের জয় হোক।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

**প্রকৌশলী মো. মুসলিম উদ্দিন**

# বাণী

**আহ্বায়ক**
মহান বিজয় দিবস-২০২০ স্মরণিকা প্রকাশনা কমিটি
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্র

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্র-এর উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস-২০২০ উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মহতী এই উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। আশা করি প্রকৌশলীদের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের ধারণার ওপর ভিত্তি করে সংকলিত ম্যাগাজিন নতুন ধারার প্রবর্তন করবে।

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল দিন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃতে ১৯৭১ সালের এই দিনে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় মহান মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়, বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আজকের এই দিনে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পরিচালিত হয় আমাদের দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি বঙ্গমাতাসহ ১৫ আগস্টের শাহাদতবরণকারী জাতির পিতার পরিবারের সকল সদস্য, শহীদ জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও সম্ভ্রমহারা দুই লক্ষ মা-বোনসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাকে।

বাংলাদেশের পেশাদার সংগঠনগুলোর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) একটি অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় সংগঠন। গ্রামীণ যোগাযোগসহ বিভিন্ন পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, শিক্ষা বিস্তার, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও স্বাস্থ্যের অগ্রগতি এবং অন্যান্য রপ্তানিমুখী প্রসারে কলকারখানাসহ প্রায় সকল অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার নেপথ্যে নীরবে কাজ করে গেছে প্রকৌশলী সমাজ। অথচ সুনামের অংশীদার হতে এবং প্রাপ্য স্বীকৃতি অর্জনে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছে যা পুনরুদ্ধার ও পূণঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে প্রকৌশলীদের মর্যাদার দিক থেকে কোন অবস্থানে রয়েছে, তা অনুধাবন; পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করার সময় হয়েছে। সর্বজনবিদিত যে, প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বের কারণে প্রকৌশল ছাত্র অবস্থায় তারা একটা বিশেষ মর্যাদার আসনে থাকলেও সে অনুপাতে কর্মজীবনে মর্যাদা, স্বীকৃতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির দিক থেকে তারা সে অবস্থান ধরে রাখতে পারছেনা; অথচ উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেট বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করে দেশ গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং এমনকি কোভিড-১৯ এর দুর্যোগময় মুহূর্তে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরিবহন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহ এবং তথ্য যোগাযোগসহ সকল অতি প্রয়োজনীয় সেবাগুলো প্রদান করে যাচ্ছে, যা জনগণের অনুভবে থাকা প্রয়োজন। সমাজে নেতিবাচক ধারণা দিয়ে প্রতিনিয়ত হেয়প্রতিপন্ন হয়ে মর্যাদার আসনে আসীন হতে ও সুযোগ-সুবিধা অর্জনে তাদের অবস্থান একবারে তলানিতে এসে পৌঁছেছে। একটু গভীরে গেলে দেখা যাবে, স্বাধীনতাযুদ্ধ থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে দেশগঠনে প্রকৌশলীগণ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে গেছেন। কিন্তু সমাজে তাদের মূল্যায়ন নেই, নেই কোনো স্বীকৃতি। স্বাধীনতাযুদ্ধে অবকাঠামোর ন্যূনতম ক্ষতি সাধন করে হানাদার বাহিনীর অভিযান ঠেকানোর কৌশলগত কর্মকান্ড, স্বাধীনতা পরবর্তী জাতির অবকাঠামো পুণর্গঠন ও স্বনির্ভরতা অর্জনে প্রকৌশলীদের অবদান সমাজের আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে প্রকৌশলীদের মর্যাদা ও অবস্থানকে কীভাবে আরও সমুন্নত রাখা যায়, এ বিষয়ে সকলের সম্মিলিত চিন্তার খোরাক রয়েছে। এ বিষয়টি লক্ষ রেখে আইইবি ঢাকা কেন্দ্র মহান বিজয় দিবস-২০২০ উপলক্ষে প্রকাশিত ম্যাগজিনের প্রধান উপজীব্য হিসেবে দেশের বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়নের পেছনে প্রকৌশলীদের অবদানগুলো ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। 'প্রচারেই প্রসার' প্রবাদের প্রতি লক্ষ রেখে আইইবি এবার প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ম্যাগাজিন ও প্রামাণ্যচিত্র নতুন আঙ্গিকে ৩ পর্যায়ে বাংলাদেশ গঠনে প্রকৌশলীদের অবদান তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস নেয়া হয়েছে, যা ধারাবাহিকভাবে উত্তরোত্তর চর্চিত হবে এবং প্রকৌশল পেশার প্রাপ্য সম্মান ও গৌরব কাঙ্ক্ষিত লেভেলে প্রতিষ্ঠিত হবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

**প্রকৌশলী মো. আলি আখতার হোসেন**

# বাণী

**সদস্য সচিব**
সম্পাদনা পরিষদ
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্র

স্বাধীন। আমার আছে স্বাধীনতা। এই এক ভাবনা, চেতনাতেই হিমালয় পাড়ি দেবার উদ্দীপনা তৈরি হয় মুহূর্তেই। হারিয়ে যায়, ম্লান হয়ে যায়, জমে থাকা দুঃখ-বেদনা-কষ্ট। হতাশার কালো মেঘ সরে দেখা দেয় অপার সূর্য কিরণ।

বিজয়ের ৪৯ পেরিয়ে ৫০ এ আমরা। জীবন উৎসর্গ করা অকুতোভয় বীর সন্তানদের গভীর বেদনা ও পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি। একই সঙ্গে সকল মুক্তিযোদ্ধাকে, বীরঙ্গনাদের শ্রদ্ধাচিত্তে মনে করছি। মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহযোগিতা করা জনগণ ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের ভূমিকাকেও আজ মনে করছি পরম কৃতজ্ঞতায়।

বাংলাদেশের পঞ্চাশ আর জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী-এই মিলিয়ে এ যেন এক মাহেন্দ্রক্ষণ আজ আমাদের। স্বাধীনতা অর্জনের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের জন্য এমন কালের তৈরি হওয়া আমাদের জাতির জন্য সত্যিই সৌভাগ্যের।

স্বাধিকার সেই একাত্তর এবং তারও আরো সংগ্রামের সময় থেকে প্রকৌশলীদের ভূমিকার বেশির ভাগই অজানা। অজানা স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনায় প্রকৌশলীদের সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন অবদানের কথা।

স্বাধীনতার এই ক্ষণকে স্মরণ এবং প্রকৌশলীদের নানা ভূমিকা ও অবদানকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ঢাকা কেন্দ্রের বাংলাদেশের ইঞ্জিন 'দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স' নামের এই স্মরণিকা করার উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

এই স্মরণিকায় ইঞ্জিনিয়ারদের অবদান তুলে ধরার এই ছোট্ট প্রচেষ্টা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে দেশ গঠনে এমনকি ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে প্রকৌশলীদের ভূমিকা তুলে ধরার এই প্রয়াস সত্যি সময়ের প্রয়োজনে। কারণ, দেশের ইঞ্জিনিয়াররা সব সময়ই প্রচারবিমুখ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের অগ্রযাত্রা, ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১ এবং ডেল্টা ২১০০ বাস্তবায়নে দেশের প্রকৌশলীদের নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বড় বড় সব প্রকল্পগুলো এগিয়ে যাচ্ছে প্রকৌশলীদের হাত ধরে। এমনকি এই কোভিডকালেও সব কিছু যখন অচল প্রায়, তখন দেশের শত শত, হাজার হাজার প্রকৌশলী এগিয়ে এসেছেন, সচল রেখেছেন দেশকে। গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি কিংবা অনলাইনে যোগাযোগ রক্ষার নেপথ্যে ছিলেন এই ইঞ্জিনিয়াররা। তারপরও যোগ্য স্বীকৃতিটুকু পাননি দেশের প্রকৌশলীরা। কোথাও কোনো আলোচনায়ও নেই তাঁরা।

ধন্যবাদ আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রকে এই অবদানে আলোকপাত করার জন্য। এই আলোয় আলোকময় হোক প্রকৌশলীদের ভাবমূর্তি এই আশা ও কামনা রইলো।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

**প্রকৌশলী মোহাম্মদ মোহসিউল ইসলাম (আদনান)**

# স্মরণ : আমাদের অগ্রপথিক

পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি
বাংলাদেশের প্রকৌশল পেশার দিশারী
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক

**মরহুম প্রকৌশলী এম.এ. জব্বার-কে**
[১৯০৬-১৯৭২]


বাংলাদেশের ইঞ্জিন
দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স


## সম্পাদনা পরিষদ

আহ্বায়ক
**প্রকৌশলী মো. আলী আখতার হোসেন**, এফ/৫৮০২

সদস্য-সচিব
**প্রকৌশলী মোহাম্মাদ মোহসিউল ইসলাম (আদনান)**, এম/২৫৭০৭

সদস্য
**প্রকৌশলী তরুন কুমার নাথ**, এফ/৮৪১১
**প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন**, এফ/৮৮০২
**প্রকৌশলী ধরিত্রি কুমার সরকার সবুজ**, এফ/১০০৫০
**প্রকৌশলী মো. শফিকুল ইসলাম (বিদ্যুৎ)**, এফ/১৩০১৩
**প্রকৌশলী মোহাম্মাদ জাফর ইকবাল**, এফ/১৩২৪৪
**প্রকৌশলী তানজিলা খানম**, এফ/১৩৩৫৪


প্রকাশনায়
**ইলিউশন**

প্রকাশকাল
**জানুয়ারি, ২০২১**

# রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত

## পাঁচজন প্রকৌশলী বীর মুক্তিযোদ্ধা

**প্রকৌশলী মসরুর-উল-হক (কমল) সিদ্দিকী**
বীর উত্তম
এফ-১১৭০

**জেনারেল (অব.) প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান**
বীর বিক্রম
এফ-৫৮৮২

**প্রকৌশলী এ.কে.এম. ইসহাক**
বীর প্রতীক
এফ-১৮৯২

**লে. কর্নেল (অব.) প্রকৌশলী এস.আই.এম. নূরুন্নবী খান**
বীর বিক্রম
এফ-১৫৭১

**প্রকৌশলী গোলাম আজাদ**
বীর প্রতীক
এফ-৫৮৬৩

## যাঁদের ত্যাগে স্বাধীন প্রদেশ

**গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি '৭১-এর মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী সূর্যসন্তানদের।**

## স্মরণ করছি —

শহীদ প্রকৌশলী আলতাফ হোসেন
শহীদ প্রকৌশলী মোহাম্মদ শামসুজ্জামান
শহীদ প্রকৌশলী আবুল কালাম মোঃ শামসুদ্দীন
শহীদ প্রকৌশলী এ কে এম নূরুল হক
শহীদ প্রকৌশলী মোজাম্মেল হক চৌধুরী
শহীদ প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম
শহীদ প্রকৌশলী মোঃ গোলাম সারওয়ার
শহীদ প্রকৌশলী ক্যাপ্টেন মাহমুদ হোসেন আখন্দ
শহীদ প্রকৌশলী নওশাদ আলী তরফদার
শহীদ প্রকৌশলী শামসুজ্জামান
শহীদ প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম
শহীদ প্রকৌশলী মোহাম্মদ নূর হোসেন
শহীদ প্রকৌশলী মুন্সী এরশাদ উল্লা
শহীদ প্রকৌশলী ফারুক আহমেদ
শহীদ প্রকৌশলী বাদশা আলম শিকদার
শহীদ প্রকৌশলী মোজাম্মেল আলী
শহীদ প্রকৌশলী এ.কে. মাহমুদ চৌধুরী
শহীদ প্রকৌশলী মোহাম্মদ আফতার হোসেন
শহীদ প্রকৌশলী আবু সালেহ মোহাম্মদ এরশাদ উল্লাহ
শহীদ প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল আনোয়ার
শহীদ প্রকৌশলী আহমদুর রহমান
শহীদ প্রকৌশলী ফজলুর রহমান
শহীদ প্রকৌশলী সেকান্দার হায়াত চৌধুরী
শহীদ প্রকৌশলী মোজাম্মেল হক
শহীদ প্রকৌশলী লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন
শহীদ প্রকৌশলী লে. কর্ণেল আবদুল কাদির

এবং

সকল বীরশ্রেষ্ঠসহ স্বাধীনতাযুদ্ধের অজ্ঞাতনামা শহীদদের।

# AIMS AND OBJECTIVES OF IEB

The Aims and objectives of The Institution are to-

Promote and advance the science, practice and business of engineering in all its branches throughout Bangladesh and abroad.

Promote efficiency in the engineering practices and profession.

Regulate the professional activities and assist in maintaining high standards in the general conduct of its members.

Lay down professional code of ethics and to make it mandatory for its members to abide by the same in their professional conduct.

Help in the acquisition and interchange of technical knowledge among its members.

Promote the professional interest and social welfare of its members.

Encourage original research in engineering and conservation and economic utilization of the country's materials and resources.

Foster co-ordination with similar institutions in other countries and engineering universities, institutions and colleges in Bangladesh and in other countries, for mutual benefits in furthering the objectives of the Institution.

Diffuse among its members information on all matters affecting engineering and to encourage, assist and extend knowledge and information.

Promote the study of engineering with a view to disseminating information obtained, for facilitating scientific, engineering and economic development of Bangladesh.

Co-operate with various Government Agencies and Industrial and Commercial Enterprises connected with engineering and advising them in matters concerning the profession and practices of engineering and promotion of technical education.

**"Let the Institution be the second home of Engineers of Bangladesh"**

# আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের
# নির্বাহী কমিটি ও কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ [মেয়াদ : ২০২০-২০২২]

**প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন**, এফ/৪০৩৮, চেয়ারম্যান
**প্রকৌশলী হাবিব আহমদ হালিম (মুরাদ)**, এফ/৮৬৯৯, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি)
**প্রকৌশলী মোঃ মুসলিম উদ্দিন**, এফ/৭৮৯৩, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন, পিএন্ডএসডব্লিউ)
**প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার**, এফ/৭৭৮৮, সম্মানী সম্পাদক
**প্রকৌশলী মোঃ ওয়ালিউল্লাহ সিকদার**, এফ/৪০৩৭, প্রাক্তন চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে কাউন্সিল সদস্য)
**প্রকৌশলী মোঃ শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু)**, পিইঞ্জ, এফ/৫৩৩৩, প্রাক্তন সম্মানী সম্পাদক (পদাধিকারবলে কাউন্সিল সদস্য)
**প্রকৌশলী মোঃ আলী নূর রহমান, পিইঞ্জ**, এফ/৫৬৭৪, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী খলিলুর রশিদ**, এফ/৬০৩২, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর হোসেন খান**, এফ/৬৪৮৭, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী মো. জিল্লুর রহমান**, এফ/৭২৭৩, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী মো. মতিউর রহমান**, এফ/৭৮০২, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী কাজী মুশতাক উল্লাহ**, এফ/৮১১৮, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী নুরে আলম সিদ্দিকী**, এফ/৮৮৭৫, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী মাহাবুব আলম**, এফ/১০১৮০, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবু সাঈদ**, এফ/১০৬৩৪, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী পঙ্কজ কুমার নাথ**, এফ/১১৭০৩, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী ইদি আমিন সরকার**, এফ/১২৩৪৫, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী মু. আসগার আলী**, এফ/১২৫৭৪, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী আলাউদ্দিন আহমেদ**, এফ/১২৭৭০, কাউন্সিল সদস্য
**অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোঃ ইকবাল মাহমুদ**, এফ/১২৯০৪, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী মোহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম**, এফ/১২৯০৭, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল ইসলাম (বিদ্যুৎ)**, এফ/১৩০১৩, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী সুশঙ্কর চন্দ্র আচার্য্য**, এফ/১৩০৫২, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাফর ইকবাল**, এফ/১৩২৪৪, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী তানজিলা খানম**, এফ/১৩৩৫৪, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী শেখ নইম আহমেদ**, এফ/১৩৩৫৫, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী আব্দুস সালাম মোল্লা**, এম/২২৮৮৬, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী শামীম আরা বেগম**, এম/২৫৭২১, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী প্রেম কুমার মন্ডল**, এম/২৭২৭৭, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান (স্বাধীন)**, এম/২৮৬৫৯, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী সৈয়দ শিহাবুর রহমান**, এম/২৮৮১৯, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী মোঃ মহিদুল হাসান**, এম/৩৬৪৭৮, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী তানভীর মাহ্‌মুদুল হাসান**, এম/৩৮৫২৪, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী মো. নাসির উদ্দিন**, এম/৩৮৮৬২, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী মো. ইশফাক আবির**, এম/৪০২০৫, কাউন্সিল সদস্য
**প্রকৌশলী রেজাউল করিম**, এম/৪০৫৭০, কাউন্সিল সদস্য

## টাঙ্গাইল উপকেন্দ্র

**অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. ইকবাল মাহমুদ**, এফ/১২৯০৪, চেয়ারম্যান, আইইবি, টাঙ্গাইল উপকেন্দ্র
**প্রকৌশলী সাধন চন্দ্র ধর**, এফ/৪৭৮৪, ভাইস চেয়ারম্যান, আইইবি, টাঙ্গাইল উপকেন্দ্র
**প্রকৌশলী মুহাম্মদ নাজমুল হক খান**, এম/২৫৬৪৫, ভাইস চেয়ারম্যান, আইইবি, টাঙ্গাইল উপকেন্দ্র
**প্রকৌশলী খন্দকার সাঈদ আল খালিদ সোপান**, এম/২৬০৪৪, সম্পাদক, আইইবি, টাঙ্গাইল উপকেন্দ্র

# আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ

## মেয়াদ ঃ ২০২০-২০২২

**প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন**, এফ/৪০৩৮
চেয়ারম্যান
আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র

**প্রকৌশলী হাবিব আহমদ হালিম (মুরাদ)**, এফ/৮৬৯৯
ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি)
আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র

**প্রকৌশলী মোঃ মুসলিম উদ্দিন**, এফ/৭৮৯৩
ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন, পিএন্ডএসডব্লিউ)
আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র

**প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার**, এফ/৭৭৮৮
সম্মানী সম্পাদক
আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র

# আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ

## মেয়াদ ঃ ২০২০-২০২২

**প্রকৌশলী মোঃ ওয়ালিউল্লাহ সিকদার,** এফ/৪০৩৭
প্রাক্তন চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে কাউন্সিল সদস্য)

**প্রকৌশলী মোঃ শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ,** এফ/৫৩৩৩
প্রাক্তন সম্মানী সম্পাদক (পদাধিকারবলে কাউন্সিল সদস্য)

**প্রকৌশলী মোঃ আলী নূর রহমান, পিইঞ্জ,** এফ/৫৬৭৪
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী খলিলুর রশিদ,** এফ/৬০৩২
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর হোসেন খান,** এফ/৬৪৮৭
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী মো. জিল্লুর রহমান,** এফ/৭২৭৩
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী মো. মতিউর রহমান,** এফ/৭৮০২
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী কাজী মুশতাক উল্লাহ,** এফ/৮১১৮
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী নুরে আলম সিদ্দিকী,** এফ/৮৮৭৫
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী মাহাবুব আলম,** এফ/১০১৮০
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবু সাঈদ,** এফ/১০৬৩৪
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী পঙ্কজ কুমার নাথ,** এফ/১১৭০৩
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী ইদি আমিন সরকার,** এফ/১২৩৪৫
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী মু. আসগার আলী,** এফ/১২৫৭৪
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী আলাউদ্দিন আহমেদ,** এফ/১২৭৭০
কাউন্সিল সদস্য

**অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোঃ ইকবাল মাহমুদ,** এফ/১২৯০৪
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী মোহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম,** এফ/১২৯০৭
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল ইসলাম (বিদ্যুৎ),** এফ/১৩০১৩
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী সুশঙ্কর চন্দ্র আচার্য্য,** এফ/১৩০৫২
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাফর ইকবাল,** এফ/১৩২৪৪
কাউন্সিল সদস্য

# আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ

## মেয়াদ ঃ ২০২০-২০২২

**প্রকৌশলী তানজিলা খানম,** এফ/১৩৩৫৪
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী শেখ নইম আহমেদ,** এফ/১৩৩৫৫
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী আব্দুস সালাম মোল্লা,** এম/২২৮৮৬
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী শামীম আরা বেগম,** এম/২৫৭২১
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী প্রেম কুমার মন্ডল,** এম/২৭২৭৭
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান (স্বাধীন),** এম/২৮৬৫৯
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী সৈয়দ শিহাবুর রহমান,** এম/২৮৮১৯
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী মোঃ মহিদুল হাসান,** এম/৩৬৪৭৮
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী তানভীর মাহ্‌মুদুল হাসান,** এম/৩৮৫২৪
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী মো. নাসির উদ্দিন,** এম/৩৮৮৬২
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী মো. ইশফাক আবির,** এম/৪০২০৫
কাউন্সিল সদস্য

**প্রকৌশলী রেজাউল করিম,** এম/৪০৫৭০
কাউন্সিল সদস্য

# আইইবি, টাঙ্গাইল উপকেন্দ্রের কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ

## মেয়াদ ঃ ২০২০-২০২২

**অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোঃ ইকবাল মাহমুদ,** এফ/১২৯০৪
চেয়ারম্যান, আইইবি, টাঙ্গাইল উপকেন্দ্র

**প্রকৌশলী সাধন চন্দ্র ধর,** এফ/৪৭৮৪
ভাইস চেয়ারম্যান, আইইবি, টাঙ্গাইল উপকেন্দ্র

**প্রকৌশলী মুহাম্মদ নাজমুল হক খান,** এম/২৫৬৪৫
ভাইস চেয়ারম্যান, আইইবি, টাঙ্গাইল উপকেন্দ্র

**প্রকৌশলী খন্দকার সাঈদ আল খালিদ সোপান,** এম/২৬০৪৪
সম্পাদক, আইইবি, টাঙ্গাইল উপকেন্দ্র

# আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ২০২০-২২ মেয়াদের স্ট্যান্ডিং কমিটি

## উপদেষ্টা পরিষদ

**প্রকৌশলী মোঃ নূরুল হুদা**, এফ/১৮৭৯
প্রধান উপদেষ্টা

## স্টিয়ারিং কমিটি

**প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন**, এফ/৪০৩৮
আহ্বায়ক

**প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার**, এফ/৭৭৮৮
সদস্য-সচিব

## অর্থ ও বিজ্ঞাপন কমিটি

**প্রকৌশলী মোহাম্মদ শামীম আখতার**
আহ্বায়ক

**প্রকৌশলী মোহাম্মাদ ওয়ালিউল ইসলাম**, এফ/১২৯০৭
সদস্য-সচিব

## সেমিনার ব্যবস্থাপনা কমিটি

**অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান**, এফ/১১৭২৫
আহ্বায়ক

**প্রকৌশলী মীর মো. জিন্নাত আলী**, এফ/৭৩৭১
সদস্য-সচিব

## ট্রেনিং ব্যবস্থাপনা কমিটি

**অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মুনাজ আহমেদ নুর**, এফ/৬৯৫৯
আহ্বায়ক

**প্রকৌশলী মোহাম্মাদ আবু সাঈদ**, এফ/১০৬৩৪
সদস্য-সচিব

## আপ্যায়ন কমিটি

**মেজর (অব.) প্রকৌশলী মো. ফিরোজ খাননুন ফরাজি**, এফ/১০৭৬৯
আহ্বায়ক

**প্রকৌশলী আলাউদ্দিন আহমেদ**, এফ/১২৭৭০
সদস্য-সচিব

## এএমআইই পরীক্ষা ও কোচিং কমিটি

**প্রকৌশলী ইদি আমিন সরকার**, এফ/১২৩৪৫
আহ্বায়ক

**অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. ইকবাল মাহমুদ**, এফ/১২৯০৪
সদস্য-সচিব

# আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ২০২০-২২ মেয়াদের স্ট্যান্ডিং কমিটি

## ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কল্যান কমিটি

প্রকৌশলী চন্দন কুমার দাস, এফ/৯১৪৬
আহ্বায়ক

প্রকৌশলী শেখ নইম আহমেদ, এফ/১৩৩৫৫
সদস্য-সচিব

## বেসরকারী প্রকৌশলী চাকুরী সহায়তা কমিটি

প্রকৌশলী কাজী আনোয়ার হোসেন, এফ/৯০৮৯
আহ্বায়ক

প্রকৌশলী কাজী মুশতাক উল্লাহ, এফ/৮১১৮
সদস্য-সচিব

## গবেষনা ও উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি

ড. প্রকৌশলী আবদুল্লাহ আল মামুন, পিইঞ্জ, এফ/৮৩৭৭
আহ্বায়ক

প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান, এম/২৮৬৫৯
সদস্য-সচিব

## নারী ও শিশু বিষয়ক কমিটি

প্রকৌশলী তানজিলা খানম, এফ/১৩৩৫৪
আহ্বায়ক

প্রকৌশলী শামীম আরা বেগম, এম/২৫৭২১
সদস্য-সচিব

## প্রবীণ প্রকৌশলী হিতৈষী কমিটি

প্রকৌশলী মো. রহমতউল্লাহ্, এফ/১৬৪৩
আহ্বায়ক

প্রকৌশলী আর. জে. এম. রবিউল কাইজার, এফ/৩১৪৭
সদস্য-সচিব

## অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারন কমিটি

প্রকৌশলী মো. হুমায়ূন কবির চৌধুরী, এফ/২৯৫০
আহ্বায়ক

প্রকৌশলী সৈয়দ শিহাবুর রহমান, এম/২৮৮১৯
সদস্য-সচিব

## প্রচার ও প্রকাশনা কমিটি

প্রকৌশলী মো. মতিউর রহমান, এফ/৭৮০২
আহ্বায়ক

প্রকৌশলী মোহাম্মাদ জাফর ইকবাল, এফ/১৩২৪৪
সদস্য-সচিব

## বেসরকারী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মান উপযোগীকরণ কমিটি

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. মাসুদুর রহমান খান তানিম, এফ/১২০৫০
আহ্বায়ক

প্রকৌশলী মো. মহিদুল হাসান, এম/৩৬৪৭৮
সদস্য-সচিব

# আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ২০২০-২২ মেয়াদের স্ট্যান্ডিং কমিটি

## পেশাগত সমস্যা ও নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি

প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান, এফ/৩৪৭২
আহ্বায়ক

প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর হোসেন খান, এফ/৬৪৮৭
সদস্য-সচিব

## আইসিটি বিষয়ক কমিটি

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম, এফ/৯৩৩৯
আহ্বায়ক

প্রকৌশলী তানভীর মাহমুদুল হাসান, এম/৩৮৫২৪
সদস্য-সচিব

## কারিগরী ভ্রমণ কমিটি

প্রকৌশলী মুহাম্মদ আবু তালেব, এফ/৮৪২৪
আহ্বায়ক

প্রকৌশলী মো. নাসির উদ্দিন, এম/৩৮৮৬২
সদস্য-সচিব

## উপহার ও সাজসজ্জা বিষয়ক কমিটি

প্রকৌশলী মো. আলী নূর রহমান, পিইঞ্জ, এফ/৫৬৭৪
আহ্বায়ক

প্রকৌশলী প্রেম কুমার মন্ডল, এম/২৭২৭৭
সদস্য-সচিব

## ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি

প্রকৌশলী মোহাম্মাদ মাইনুল ইসলাম, এফ/৯৩১৩
আহ্বায়ক

প্রকৌশলী রেজাউল করিম, এম/৪০৫৭০
সদস্য-সচিব

## অডিট কমিটি

প্রকৌশলী মো. শাহজাহান মোল্লা, এফ/৬৯৬৪
আহ্বায়ক

প্রকৌশলী নুরে আলম সিদ্দিকী, এফ/৮৮৭৫
সদস্য-সচিব

# সূচীপত্র

## প্রতিবেদন


২৬ যাঁদের ত্যাগে সচল হলো স্বাধীন বাংলাদেশ

৩৩ দারিদ্র্য দূর করার যুদ্ধে জয় এনেছে যে প্রকৌশল

৪১ লকডাউনে সচল, দুর্যোগেও অটল

৪৮ দেশীয় শিল্প খাত: উদ্যোগের অগ্রভাগে, বিবর্তনের নেপথ্যে

৫৫ দেশীয় প্রকৌশলীদের হাতেই আগামীর নির্মাণ


## সাক্ষাৎকার


৩০ তরুণ প্রকৌশলীরা বিদেশমুখী হচ্ছে না - প্রকৌশলী আবদুস সবুর

৩৮ উন্নয়নের সামনের সৈনিক প্রকৌশলীরা - প্রকৌশলী নুরুল হুদা

৪৬ এখন মেধাবী ছেলেমেয়েরা কৃষি প্রযুক্তি ও প্রকৌশল পড়তে আসছে - প্রকৌশলী রহমতউল্লাহ

৫২ টেন্ডারেই শর্ত দিন, প্রকল্পে অন্তত একশ দেশি ইঞ্জিনিয়ার থাকতে হবে - অধ্যাপক শামীম জেড বসুনিয়া

৫৯ শতভাগ বিদ্যুতায়নে প্রকৌশলীরাই অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন - প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ

৬২ তরুণ প্রকৌশলীরা দারুণভাবে এগোচ্ছে - আইনুন নিশাত


## ছবির অ্যালবাম


৬৫ আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের নানা কার্যক্রম

# যাঁদের ত্যাগে সচল হলো স্বাধীন বাংলাদেশ

**আমাদের প্রথম বড় যুদ্ধটা ছিল স্বাধীনতার। বিজয় আসে ৯ মাসে, লাখো শহীদের রক্তের দামে। কিন্তু সেই যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয় লাখ লাখ ঘরবাড়ি, অফিস, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। ভেঙে পড়ে রাস্তা, সেতু, রেলপথসহ গোটা যোগাযোগ অবকাঠামো। বন্ধ হয়ে পড়ে শত শত কলকারখানা। কার্যত অচল হয়ে পড়ে সদ্যস্বাধীন একটি দেশ। একটি যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই সামনে চলে আসে দেশকে গড়ে তোলার নতুন সংগ্রাম। তাতেও বিজয় আসে, তিন বছর না যেতেই। অচল বাংলাদেশ সচল হয়। স্বাধীনতা থেকে স্বনির্ভরতার পথে শুরু হয় নতুন যাত্রা। দ্বিমাত্রিক এই যুদ্ধে সব পেশার, সব ধরনের মানুষের আত্মত্যাগ আছে। কিন্তু বিজয়ের ৫০ বছরে এসে, এই লেখায় আমরা ফিরে দেখেছি, মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সচল করায় প্রকৌশলীদের অবদান, যা ইতিহাসের পাতায় টুকরো টুকরো করে লেখা আছে ঠিকই, কিন্তু আলোচনায় আসেনি এতকাল...**

২৮ অক্টোবর, ১৯৭১। দুপুর ১২টায় ঢাকার পাকিস্তান টেলিভিশন অফিস কেঁপে উঠলো। ছাদে বসানো রিলে অ্যান্টেনা এবং সাততলার দেয়ালের একাংশ ধসে পড়লো। জানালা দিয়ে সমস্ত ফাইল, কাগজ বাইরে বের হয়ে আসছে। ঠিক যেন সিনেমার কোনো দৃশ্য। এই ছবি পরদিনই প্রকাশিত হয়, বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে। বিশ্ববাসী জেনে যায়, ঢাকায় পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ করছেন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা।

ঢাকার এই গেরিলা অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা নাসির উদ্দীন ইউসুফ। সেদিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল টাওয়ারটা ফেলে দেয়া। যদিও আমরা পুরোটা করতে পারিনি। পরিকল্পনা ছিল, ওপরের টাওয়ারের চারটি পায়ে বিস্ফোরণ ঘটাবো। টাওয়ারটা পড়ে যাবে, কিন্তু বিল্ডিংয়ের ক্ষতি হবে না। কৌশলটি আমরা জেনেছিলাম দি ইঞ্জিনিয়ার্সের এস আর খান সাহেবের কাছ থেকে। তারাই বিল্ডিংয়ের নকশা দেখিয়ে বলে দিয়েছিলেন, কোথায় বিস্ফোরক লাগালে ভবনের ক্ষতি হবে না, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হবে।'

মুক্তিযুদ্ধে প্রকৌশলীদের ভূমিকা নিয়ে এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে কথা বলেন এই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। জানান, শুধু ডিআইটি অভিযান নয়, মুক্তিযুদ্ধে ঢাকার গেরিলা যোদ্ধারা ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের যত সেতুতে অভিযান চালিয়েছে, তার বেশির ভাগের তথ্যই সরবরাহ করেছে দি ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড।

এমন আরো অনেক অভিযানের মধ্যে একটি হয়েছিল ১৯৭১ এর ১৪ নভেম্বর, ধামরাই থেকে তিন কিলোমিটার দূরের ভায়াডুবি সেতুতে। নাসিরউদ্দীন ইউসুফসহ গেরিলা যোদ্ধারা স্থানীয় রাজাকারদের হটিয়ে ততক্ষণে দখল নিয়েছেন সেতুটির। লক্ষ্য ছিল, সেটি উড়িয়ে দেয়া, যাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকায় ঢুকতে না পারে। সেতুর উপরে বালুর বস্তা আর বিস্ফোরক বসাতে না বসাতেই মানিকগঞ্জ থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুটি গাড়ি এসে উপস্থিত হয় সেখানে। শুরু হয় সামনাসামনি যুদ্ধ। শহীদ হন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা মানিক। সেদিন সফল না হলেও একই পদ্ধতিতে, ডিসেম্বরের ১৮ তারিখ ভায়াডুবি সেতু উড়িয়ে দেন গেরিলারা।

ঠিক কোন রণকৌশলে এগুলো করা হতো, এমন প্রশ্নে নাসির উদ্দীন ইউসুফ বলেন, "খালেদ মোশাররফ বলে দিয়েছিলেন যেকোনো একটি ব্রিজ নষ্ট করো, যে নদী বা খালটি সুগভীর। যাতে পাকিস্তানিদের রিপেয়ারিং করে আসতে বেশ কয়েক মাস লেগে যায়। যদি বেশি সেতু ভাঙি তবে, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এই ব্রিজগুলো আবার আমাদের নতুন করে তৈরি করতে হবে। যেটা একটা সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য বড় সংকট হবে।"

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের অনুরোধে, মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে সাড়ে তিন হাজার সেতু ও কালভার্টের একটি তালিকা তুলে দিয়েছিলেন প্রকৌশলী শরীফ ইমাম। তিনি শহীদ গেরিলা রুমীর বাবা। তার চাকরি শুরু তৎকালীন কমিউনিকেশন ও

বিল্ডিং বিভাগের (সিএন্ডবি) ডিজাইন শাখায়, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। পরে সরকারি চাকরি ছেড়ে তিনি দি ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডে যোগ দেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ইমাম পরিবার সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। শরীফ ইমাম ও তার বন্ধু সাজেদুর রহমান খান টাকা সংগ্রহ করে অল্প অল্প করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পাঠাতেন। বিভিন্ন প্রয়োজনে বীর মুক্তিযোদ্ধারা শরীফ ইমামের 'কণিকা' বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন। জুলাই মাসের শুরুর দিকে ২ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফের একটি চিঠি নিয়ে গেরিলা যোদ্ধা শাহাদাত চৌধুরী ও হাবিবুল আলম আসেন শরীফ ইমামের বাড়িতে। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়, শহীদজননী জাহানারা ইমামের লেখা বই, 'একাত্তরের দিনগুলিতে'। বইতে জাহানারা ইমাম লিখেছেন: গেরিলারা কেন এসেছে জানতে চাইলে শরীফ তাঁকে বলেন, খালেদ মোশাররফ বাংলাদেশের সবকটা ব্রিজ আর কালভার্টের তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে। সেই সঙ্গে ব্রিজ ও কালভার্ট ওড়ানোর ব্যাপারে কতকগুলো তথ্য। ব্রিজের ঠিক কোন্ কোন্ পয়েন্টে এক্সপ্লোসিভ বেঁধে ওড়ালে ব্রিজ ভাঙবে অথচ সবচেয়ে কম ক্ষতি হবে অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হবার পর খুব সহজে মেরামত করা যাবে তার বিস্তারিত তথ্য ও নির্দেশ। তাদের উদ্দেশ্য ভেতরে যতগুলো পারা যায় ব্রিজ আর কালভার্ট ভেঙে পাক সেনাবাহিনীর যোগাযোগ ও চলাচলকে অচল করে দেওয়া।

তখন সড়ক শাখার ডিজাইন ডিভিশনের নির্বাহী ছিলেন একজন অবাঙালি প্রকৌশলী। অনেকটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেখান থেকে সব তথ্য ও নথি সংগ্রহ করেন শরীফ ইমাম। দুই সহকর্মীকে নিয়ে টানা তিন দিনের চেষ্টায় সাড়ে তিন হাজার ব্রিজ আর কালভার্টের তালিকা তৈরি করেন তিনি। ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের অফিসের ওপর নজরদারি থাকায় মুক্তিযোদ্ধা শাহাদত চৌধুরী আর হাবিবুল আলমকে

ব্রিজের ঠিক কোন্ কোন্ পয়েন্টে এক্সপ্লোসিভ বেঁধে ওড়ালে ব্রিজ ভাঙবে অথচ সবচেয়ে কম ক্ষতি হবে অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হবার পর খুব সহজে মেরামত করা যাবে-তার বিস্তারিত তথ্য ও নির্দেশ।

তাঁর বাসা থেকে তালিকাগুলো হস্তান্তর করেন শরীফ। জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলি অনুযায়ী, এই ঘটনা ১৯৭১ সালের ৭ ও ৮ জুলাইয়ের। এরও প্রায় দুই মাস আগে, অর্থাৎ ১৯৭১ এর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে জেড ফোর্সের মোহনগঞ্জ সাব-সেক্টরে ডাক পড়ে প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলীর। তিনি তখন চট্টগ্রামের ইস্টার্ন ক্যাবলের তরুণ প্রকৌশলী। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে ২৫শে মার্চেই চাকরি ছেড়ে যোগ দেন যুদ্ধে। সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন চট্টগ্রামে। ১১ দিন পর, পাকিস্তানী বাহিনী চট্টগ্রামের দখল নিলে চলে যান কলকাতায়। সেখানেই তার দেখা হয় জেড ফোর্সের সাবসেক্টর কমান্ডার হামিদউল্লাহ খানের সঙ্গে।

'হামিদউল্লাহ খান আমাকে বললেন, তোমার মতো প্রকৌশলী আমাদের দরকার। তুমি আমাদের ক্যাম্পে আসো,' বিজয়ের ৫০ বছরে দাঁড়িয়ে এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করছিলেন মোহাম্মদ আলী। 'আমার কাজ ছিল রেকি করা। কোথায় কোথায় অপারেশন চালানো হবে। কোন রাস্তাটা আমরা আটকে দেবো। কোন ব্রিজটি

*মুক্তিযুদ্ধে যশোরের ক্ষতিগ্রস্ত একটি ব্রিজ*

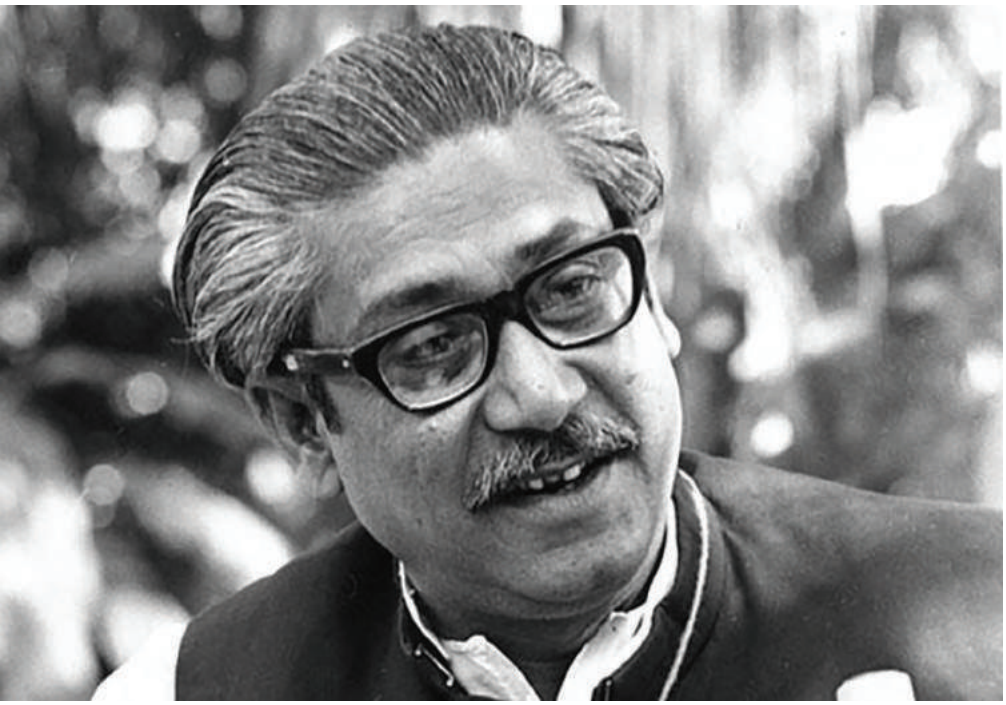

**‘সেদিন বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, ‘তোমরা যেভাবে নিজেদের জীবন বাজি রেখে দেশটা স্বাধীন করছো, এখন দেশটা গড়তে পারবে না?’ উপস্থিত প্রকৌশলীরা হাত তুলে সমস্বরে শ্লোগান তুলে জবাব দিয়েছিল, পারবো, করবো, এভাবেই সেদিনের বিবরণ তুলে ধরেন মোহাম্মদ আলী। তার ভাষায়, ‘এরপর থেকেই শুরু হয় দেশ গড়ার নতুন যুদ্ধ।’**

ভাঙ্গবো এবং এমনভাবে ভাঙ্গবো যাতে শুধু পাকিস্তানী মিলিটারির গাড়ী বা জিপগুলো বাধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ চলাচল করতে পারে। আমরা সেতুগুলো এমন ভাবে ভাঙ্গতাম, যাতে দ্রুত সেগুলো সংস্কার করা যায়।’

বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসে প্রকৌশলী এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান নিয়ে গর্ব করেন মোহাম্মদ আলী। বিশেষ করে, ১১ দফার আন্দোলনে। স্মৃতি হাতড়ে তিনি ফিরে যান, ১৯৬৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারিতে। ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে যখন গুলি করে মেরে ফেলা হয়, তখন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই তার প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কারফিউ উপেক্ষা করে, মাইক আর মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা বুয়েট থেকে জহুরুল হকের এলিফ্যান্ট রোডের বাসায় গিয়েছিল,’ তিনি বলেন দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে।

মোহাম্মদ আলী বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধিকার সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন করেছে বুয়েটের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়) শিক্ষার্থীরা। আর তাই স্বাধীনতাসংগ্রামের রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আস্থার জায়গাও ছিল প্রকৌশলী আর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বাধীনতাযুদ্ধের ডাক সারাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে, প্রকৌশলীদের সহায়তা চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তার নির্দেশ মেনে, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা একটি ট্রান্সমিটার তৈরি করেছিলেন। এই কাজে নেতৃত্ব দেন তড়িৎ কৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. নুরুল উল্লাহ। স্বাধীনতার পর দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকায় তিনি যে সাক্ষাৎকার দেন, তাতে এই ঘটনার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়।

“৭ই মার্চের পরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের কিছু ছেলে এসে আমাকে ধরল, স্যার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের যন্ত্রপাতি দিয়ে একটি ওয়্যারলেস স্টেশন তৈরি করতে হবে। আমি ওদের কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। এরপর ওরা একদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথা ঠিক করে আমাকে তার ধানমন্ডির বাড়িতে নিয়ে গেলেন,” বলেন ড. উল্লাহ।

ছাত্ররা পরিচয় করিয়ে দিতেই, বঙ্গবন্ধু সোফা থেকে ঘরের এক কোণে নিয়ে যান এই প্রকৌশলীকে। “আমার কাঁধে হাত রেখে অত্যন্ত সন্তর্পণে বললেন, 'নুরুল উল্লাহ, আমাকে একটা ট্রান্সমিটার তৈরি করে দিতে হবে। আমি যাবার বেলায় শুধু একবার আমার দেশবাসীর কাছে কিছু বলে যেতে চাই। তুমি আমাকে কথা দাও, যেভাবেই হোক একটা ট্রান্সমিটার আমার জন্য তৈরি রাখবে। আমি শেষবারের ভাষণ দিয়ে যাব,” বাংলার বাণীকে বলেন এই অধ্যাপক। এর পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কাজে নেমে পড়েন তিনি। তড়িৎ কৌশল বিভাগের প্রধান ড. জহুরুল ইসলামসহ প্রায় সব শিক্ষকের সহযোগিতায় ৯ দিনের চেষ্টায় তারা তৈরি করেন সেই ট্রান্সমিটার। “এর ক্ষমতা বা শক্তি ছিল প্রায় সারা দেশ ব্যাপী। শর্টওয়েভে এর শব্দ ধরা যেত। যদিও পরবর্তী সময়ে, সেই ট্রান্সমিটার আর ব্যবহারের সুযোগ পাননি বঙ্গবন্ধু,” সাক্ষাৎকারে বলেন ড. উল্লাহ। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর, ১০ই জানুয়ারি দেশে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। হিসাব আসে, যুদ্ধে ৪৩ লক্ষ বসতবাড়ি, ৩ হাজার অফিস ভবন ও ২৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দিয়েছে পাক বাহিনী। ধ্বংস হয়েছে ২৭৪টি ছোট-বড় সড়ক সেতু ও ৩০০টি রেলসেতু। ওই মাসের শেষ সপ্তাহেই তিনি ডেকে পাঠান প্রকৌশলীদের। বঙ্গভবনে সেই আয়োজনে দেড় থেকে দুই হাজার প্রকৌশলী যোগ দেন। মোহাম্মদ আলীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

“সেদিন বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, ‘তোমরা যেভাবে নিজেদের জীবন বাজি রেখে দেশটা স্বাধীন করছো, এখন দেশটা গড়তে পারবে না?’ উপস্থিত প্রকৌশলীরা হাত তুলে সমস্বরে শ্লোগান তুলে জবাব দিয়েছিল, পারবো, করবো, এভাবেই সেদিনের

বিবরণ তুলে ধরেন মোহাম্মদ আলী। তার ভাষায়, "এরপর থেকেই শুরু হয় দেশ গড়ার নতুন যুদ্ধ।"

স্বাধীনতার পর বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, যুদ্ধকালীন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আশ্রয় নেয়া বাংলাদেশিদের স্বাধীন ভূমিতে ফিরিয়ে আনা। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের হিসাবে, ১৯৭১ সালের পহেলা ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৭০ লাখ বাংলাদেশি ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলোতে অবস্থান করছিলেন। তাদের

**"এই পুনর্গঠনে যে অর্থ প্রয়োজন হয়েছে তার প্রায় পুরোটা সহায়তা হিসেবে বিদেশ থেকে এসেছে, কিন্তু কাজের বাস্তবায়ন স্থানীয় জনবল দিয়েই হয়েছে। আমাদের দেশের লোকেরাই সব মেরামত এবং সচল করেছে। এটা একটা ব্যতিক্রম, গোটা বিশ্বেই।"**

**ড. রেহমান সোবহান**, অর্থনীতিবিদ

ফিরিয়ে আনার পথে বড় বাধা ছিল ভঙ্গুর যোগাযোগ ব্যবস্থা।

১৯৭২ সালে দেশের প্রথম বাজেটে, তাই সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়, যোগাযোগ, শিল্প আর বিদ্যুৎ খাতের পুর্নগঠনে। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা প্রকাশিত একটি খবরে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংস হওয়া ২৪৮টি সড়ক এবং সেতু পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল, বিজয়ের তিন বছরের মধ্যেই। ঢাকাআরিচা মহাসড়কের বড় সেতুসহ নতুন ৯৭৯টি সড়ক সেতু তখনই নির্মিত হয়। রেলওয়ের ২৯৫টি ক্ষতিগ্রস্ত সেতু এবং সাড়ে ছয়শ মাইল পথও স্বাধীনতার পরপরই সংস্কার করা হয়।

অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরগুলো সংস্কারের পর, ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে, ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর এবং কুমিল্লা রুটে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ বিমান। একই সময়ে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্মাণ কাজও শুরু হয়। সচল হয় চট্টগ্রামে দেশের প্রধানতম সমুদ্রবন্দরটি।

এত দ্রুত যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলা কীভাবে সম্ভব হলো, এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানের কাছ থেকে। তিনি শিল্প, বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অবকাঠামো বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। অর্থনীতি ও অবকাঠামো পুনর্গঠনের সেই অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, "সবাই ধারণা করেছিল, হয়তো আমাদের বিদেশি সহায়তা প্রয়োজন হবে। বিশেষ করে ভারতের। কিন্তু তেমনটি হয়নি। শুধু হার্ডিঞ্জ ব্রিজ সংস্কার করতে ভারতীয়রা এসেছিল। আর চট্টগ্রাম বন্দরের মাইন সরাতে রাশিয়ার বিস্ফোরক দলের সহায়তা নেয়া হয়েছিল। এর বাইরে ছোট মাঝারি ব্রিজ, রাস্তা সব আমাদের প্রকৌশলীরাই সংস্কার করেছে। এটা হয়েছে কারণ বঙ্গবন্ধু এমনটাই চেয়েছেন।"

সরকারের প্রাথমিক পুনর্গঠন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনের পুনর্বাসন করা হয়। সিদ্ধিরগঞ্জ, ভেড়ামারা, রূপগঞ্জ, দিনাজপুর ও মেহেরপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র সচল করে জাতীয় গ্রিড কার্যকর করা হয়। একই সময় অর্থনীতি আর কর্মসংস্থানের স্বার্থে শিল্পখাতে একাধিক রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশন গড়ে তোলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর লক্ষ্য ছিল কলকারখানা ও উৎপাদন সচল রাখা।

বন্ধ কারখানা নতুন করে চালু করাতেও, প্রকৌশলীদের ভূমিকাকে স্মরণ করেন মোহাম্মদ আলী। তিনি বলেন, "যেসব কারখানা একদম অকেজো হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হয়। বাকিগুলো ছয়টি সরকারি কর্পোরেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হতে শুরু করলো, এবং এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে কারখানা সচল হলো।"নবীন একটা দেশকে ঢেলে সাজাতে ১৯৭৩ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে পাঁচসালা পরিকল্পনা, যার লক্ষ্য ছিল পুনর্গঠন ও দারিদ্র্য হ্রাসের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির হার ৩% থেকে ৫.৫%-এ উন্নীত করা। এসব উদ্যোগ এবং তাদের সাফল্য, প্রশংসা কুড়িয়েছিল বিশ্বদরবারেও, যা লিপিবদ্ধ রয়েছে জাতিসংঘের "বাংলাদেশ: ক্ষতিপূরণ ও মেরামত" সম্পর্কিত সমীক্ষায়।

ড. রেহমান সোবহান বলেছেন, "এই পুনর্গঠনে যে অর্থ প্রয়োজন হয়েছে তার প্রায় পুরোটা সহায়তা হিসেবে বিদেশ থেকে এসেছে, কিন্তু কাজের বাস্তবায়ন স্থানীয় জনবল দিয়েই হয়েছে। আমাদের দেশের লোকেরাই সব মেরামত এবং সচল করেছে। এটা একটা ব্যতিক্রম, গোটা বিশ্বেই।"

দেশকে গড়ার নতুন এই যুদ্ধ, প্রকৌশলী হবার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে তখনকার অনেক তরুণকে। যেমন: ওয়ালিউল্লাহ শিকদার। ১৯৭১ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পড়া অবস্থাতেই তিনি যোগ দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। স্বাধীনতার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য পাড়ি জমান মস্কো। দেশে ফিরে ১৯৮২ সালে ওয়াসায় যোগ দেন। তিনি বলেন, "যে দেশপ্রেম নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়াকালীন যুদ্ধে গিয়েছিলাম। সারাজীবনই তা লালন করে চলেছি। আর তার বহিঃপ্রকাশ আমাদের কাজে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৌশলী হিসেবে পেশার দায়বদ্ধতা তো আছেই। তার উপর একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যে মূল্যবোধ বা অনুভূতি, তা সবসময়ই আমাদের কাজে প্রভাবে ফেলেছে এবং আমরা সব সময়ই চেয়েছি, এই মূল্যবোধ আমাদের অনুজ প্রকৌশলীদের মাঝে ছড়িয়ে যাক। তাতে আমরা সফলও হয়েছি।"

প্রকৌশলী আবদুস সবুর, একজন সাবেক ছাত্রনেতা, সফল সংগঠক। সভাপতি আর মহাসচিব, ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদে দুই পদেই নেতৃত্ব দিয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার্স অব ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশের। সক্রিয় আছেন জাতীয় রাজনীতিতেও। বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে। দীর্ঘ আলাপচারিতায় তিনি কথা বলেছেন নিজের রাজনৈতিক জীবন, দেশ নিয়ে প্রকৌশলীদের পরিকল্পনা আর কাজের ক্ষেত্র সম্পর্কে। জানিয়েছেন বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে সাজাতে, প্রকৌশলীদের ভাবনার কথা...

সাক্ষাৎকার

# তরুণ প্রকৌশলীরা বিদেশমুখী হচ্ছে না

**প্রকৌশলী আবদুস সবুর**

**প্রশ্ন:** আপনি যখন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন, দেশে তখন সামরিক শাসন। সেই কঠিন পরিস্থিতিতে আপনি ছাত্ররাজনীতিতে সক্রিয় হলেন। কীভাবে...

**প্রকৌশলী আবদুস সবুর:** ছাত্রদের চরিত্রই কিন্তু অন্যায়অবিচারের বিপক্ষে রুখে দাঁড়ানো। তখন সময়টাই ছিল তেমন। ১৯৮১ সালে এরশাদ সামরিক শাসন শুরু করলো। বুয়েটের শিক্ষার্থীরা কিন্তু তখনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করেছে। আমিও সেই সংগ্রামে শামিল হয়েছিলাম। কলেজ থেকেই রাজনীতিসচেতন ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সেটা আরো বাড়লো। ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হলাম। সেই বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে যতটুকু করা যায় আরকি। ভোর চারটা-পাঁচটায় উঠে আমরা কারফিউ ভেঙে মিছিল করতাম। সেই সময় আমরা বন্দুকের গুলি উপেক্ষা করে হরতাল পর্যন্ত করেছি। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, সামরিক সরকার হটিয়ে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ সামনে রেখেই ছাত্ররাজনীতি করেছি। ওই বছরই অর্থাৎ ১৯৮১ সালে আমাদের নেত্রী দীর্ঘ ছয় বছর পর দেশে ফিরে এলেন। তার সহচর্যে আসার পর, দেশ নিয়ে তার স্বপ্নগুলো বুঝতে পারার পর রাজনীতিটাই করতে চেয়েছি। এখনো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসেবে সেই কাজ করে যাচ্ছি।

**প্রশ্ন:** বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতির ইতিহাসটা নিশ্চয়ই বেশ দীর্ঘ...

**প্রকৌশলী আবদুস সবুর:** অবশ্যই। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে আমাদের অনেক জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী কিন্তু জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের সাহচর্য পেয়েছেন। তার সঙ্গে স্বাধিকার আন্দোলনের সংগ্রামে যুক্ত থেকেছেন। এগারো দফা থেকে শুরু করে দেশের সকল আন্দোলন সংগ্রামেই বুয়েটের অবদানের কথা অনস্বীকার্য। মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র শহীদ হয়েছেন। আমাদের যে পতাকা, সেটাও কিন্তু প্রথম বুয়েটের আহসানউল্লাহ হল থেকে তৈরি হয়েছে। ১৯৭৫-এর বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পরও কিন্তু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। আমার সৌভাগ্য হয়েছে ১৯৮৯ সালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করার। সে সময় আমরা চেষ্টা করেছি, পূর্বসূরিদের এসব আত্মত্যাগকে স্মরণীয় করে রাখতে, সম্মান জানাতে। এ জন্য বুয়েট অডিটরিয়ামের সামনে একটি ভাস্কর্যও সে সময় নির্মাণ করা হয়েছিল আমার নেতৃত্বে।

**প্রশ্ন:** ছাত্রজীবন শেষেও আপনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, দেশে

থেকেছেন। কিন্তু আমরা তো জানি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই স্নাতকের পর বিদেশে পাড়ি জমান। আপনি গেলেন না কেন...

**প্রকৌশলী আবদুস সবুর:** ওই যে প্রথমেই বলেছিলাম, নেত্রীর সাহচর্য। তাঁর মতো মমতাময়ী মা, স্নেহময়ী বোন এমনভাবে আমাদের রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, তখন এই রাজনীতি, এই দেশসেবাকেই বড় ব্রত হিসেবে মেনে নিয়েছি। হ্যাঁ, এটা সত্য। বিদেশে যাবার সুযোগ ছিল। কিন্তু সেটা করিনি। যারা চলে গেছে, তারা যে অন্যায় করেছে, তা-ও না কিন্তু। দেশে তাদের ভালো কাজ করার কোনো সুযোগই ছিল না। বিশেষ করে আমাদের সেই সময়টাতে। সামরিক সরকারের আমলে মেধাকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। তাদের আজ্ঞাবহদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে। ফলে হাজার হাজার মেধাবী প্রকৌশলী দেশ ছেড়েছে। বিদেশে গিয়ে সাফল্যের সাথে নিজেদের কর্মজীবন পরিচালনা করছে। কিন্তু এখন কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। সেই সব প্রকৌশলীর অনেকেই কিন্তু এখন দেশে ফিরে আসছে। দেশে বিনিয়োগ করছে। দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে। তরুন প্রকৌশলীরাও বিদেশমুখী হচ্ছে না। এই যে পরিবর্তনটা, এটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টির সাফল্য।

**প্রশ্ন:** তাহলে আপনি বলতে চাইছেন, এখন মেধাবী প্রকৌশলীরা দেশে থাকতে চাইছে, তারা কি কাঙ্ক্ষিত কাজের সুযোগ পাচ্ছে?

**প্রকৌশলী আবদুস সবুর:** অবশ্যই। কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে বলেই প্রকৌশলীরা এখন দেশমুখী।

আমি এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই। বঙ্গবন্ধু যেমন আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তেমনি তাঁর সুযোগ্য কন্যা আমাদেরকে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখার সুযোগ দিয়েছেন। উন্নয়নের সঙ্গে প্রযুক্তি আর প্রকৌশলের একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। করোনার এই কঠিন সময়েও আমাদের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি'তে ৫.২৪ ভাগ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এর আগের বছর এই প্রবৃদ্ধি কিন্তু শতকরা ৮ ভাগে উঠেছিল। এটা বিশ্বজুড়ে শুধু প্রশংসিতই নয়। ঈর্ষণীয়ও বটে। জিডিপির আকারও আটাশ লাখ কোটি টাকার ওপরে চলে গেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দিন দিন রেকর্ড পরিমাণ বাড়ছে। এরই মধ্যে পূর্বাভাস এসেছে, ২০২৮ সালের মধ্যে আমরা পৃথিবীর ২৩তম বড় অর্থনীতির দেশ হবো। এই যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এটা তো একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎসহ সব ধরনের অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়নের ফলেই এমন সাফল্য এসেছে। আর এই যে সফল কাজগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের প্রকৌশলীরাই করছেন। বিকাশমান অর্থনীতিতে অনেক অনেক নতুন এবং

**আমাদের যে পতাকা, সেটাও কিন্তু প্রথম বুয়েটের আহসানউল্লাহ হল থেকে তৈরি হয়েছে। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পরও কিন্তু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। আমার সৌভাগ্য হয়েছে ১৯৮৯ সালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করার।**

উন্নত প্রযুক্তির কাজ করার সুযোগ আছে। আমাদের দেশের প্রকৌশলীদের সামনেও সেই সুযোগ এসেছে। যা কাজে লাগাতে অনেকেই দেশে থেকে যাচ্ছেন। দেশে থেকেও তারা আন্তর্জাতিক মানের কাজ করতে পারছে। সেই পরিমাণ অর্থও আয় করছে।

চলতি অর্থবছর ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট দেয়া হয়েছে। আগামী বাজেটের আকার হবে প্রায় সোয়া ছয় লাখ কোটি টাকা। এই বিশাল বাজেট, বিশাল কর্মযজ্ঞ, তা বাস্তবায়নে তো সঠিক হাত লাগবে। আমাদের প্রকৌশলীরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেই হাতে পরিণত হয়েছেন। কয়েক দিন আগে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন হয়েছে। যেটা ২০২১ থেকে ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। এতে ব্যয় হবে প্রায় ৬৫ লাখ কোটি টাকা। যেখানে ১ কোটি ১৩ লাখ নতুন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। তাই কাজের সুযোগ বা পরিধি দিন দিন বড়ই হচ্ছে।

**প্রশ্ন:** আপনি যে কাজের সুযোগের কথা বলছেন, সেগুলো করার মতো দক্ষতা কি আমাদের প্রকৌশলীদের আছে?

**প্রকৌশলী আবদুস সবুর:** আমি মনে করি এখনকার প্রকৌশলীরা অনেক মেধাবী। খেয়াল করে দেখেন, আজ আমাদের বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, কাঁচপুর ব্রিজ আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ করেছি। যদি আজ হোলি আর্টিজানের মতো ঘটনা না ঘটতো, তাহলে আমরা আরো আগেই বহু কাজ শেষ করতে পারতাম। অর্থাৎ আমাদের কারিগরি দক্ষতা বেড়েছে। আমাদের প্রকৌশলীরা আজ পদ্মা ব্রিজে কাজ করছেন। মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কিংবা রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সবখানেই আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করছেন। অর্থাৎ বিশ্বমানের প্রকৌশলী, বিশ্বমানের প্রযুক্তিবিদ আমাদের এখানে গড়ে উঠেছে। সে কারণে আমরা স্যাটেলাইট ক্লাবে নাম লিখিয়েছি। আমরা স্থলে যেমন কাজ করছি, তেমনি আকাশেও অবদান রাখছি। অনেক প্রকৌশলী উন্নত বিশ্বে কাজের পাশাপাশি দেশেও আসছেন। বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে আমরা ডিপ সি পোর্ট করছি। একটু যদি খেয়াল করেন, ১২ বছর আগে আমরা মাত্র ৩২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতাম। এখন তা কিন্তু ২৫ হাজার ছাড়িয়েছে। এটা কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনিয়াররাই করেছেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা আমাদেরকে সে সুযোগ করে দিয়েছেন। আর সে কারণে আমরা আমাদের দক্ষতা দেখাতে পারছি। আমি মনে করি, বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়াররা এখন যে কোনো বড় প্রকল্প করার ক্ষমতা রাখে, যেকোনো জটিল সমস্যা সমাধানে সক্ষম। এই দক্ষতা আছে বলেই আমি মনে করি এই উন্নয়নের সঙ্গে আমরা নিবিড়ভাবে জড়িত। বিদ্যুৎ, রেল, আইসিটি, যেকোনো খাতে আমরা অবদান রাখার সুযোগ পাচ্ছি।

আমাদের দেশের প্রকৌশল শিক্ষার মানও অত্যন্ত ভালো। বিশেষ করে আমাদের বুয়েটের ইঞ্জিনিয়াররা কিন্তু দেশের বাইরেও সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। সিলিকন ভ্যালিতে পাঁচ-ছয়শ জন ইঞ্জিনিয়ার এখন কাজ করছেন। অস্ট্রেলিয়া কিংবা জাপান, সবখানেই আছেন তারা। সুতরাং, আমি মনে করি, আমাদের দেশের প্রকৌশলীদের দ্বারা সবই সক্ষম। আমরা প্রযুক্তিকেও আত্মস্থ করতে পেরেছি।

**প্রশ্ন:** প্রকৌশলীরা ২০৩০ কিংবা ২০৪১-এর বাংলাদেশকে কোথায় দেখতে চান?

**প্রকৌশলী আবদুস সবুর:** আগামীর বাংলাদেশকে আমরা বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা, শেখ হাসিনার আধুনিক বাংলাদেশ এবং উন্নত, সমৃদ্ধ ও বিশ্বমানের একটি দেশ হিসেবে দেখতে চাই। যেখানে প্রযুক্তির কোনো অভাব হবে না, প্রকৌশলের কোনো অভাব হবে না। বঙ্গবন্ধু যেমন ইতিহাস রচনা করেছিলেন স্বাধীনতা এনে, জননেত্রী শেখ হাসিনা যেমন উন্নয়নের মহাসড়ক রচনা করেছেন, তার সারথি এবং সহযাত্রী হিসেবে আমরা যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হবো। আমরা মনে করি, ২০৪১ সালের আগেই আমরা উন্নত দেশে পরিণত হবো। সেজন্য যা যা করা দরকার, প্রকৌশলীরা করবেন এবং তাদের সেই সক্ষমতা আছে।

**প্রশ্ন:** সেই লক্ষ্য অর্জনে ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ কী ধরনের ভূমিকা রাখছে? আপনি তো এই সংগঠনের দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দিয়েছেন...

**প্রকৌশলী আবদুস সবুর:** ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, দেশের প্রাচীনতম একটি পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ ৭২ বছরের পরিক্রমায় আজ

**তারাই এখন বলে যে, তোমরা নিজেরা অনেক সক্ষম। সেখান থেকে আইবির মাধ্যমে টেকনোলজি ট্রান্সফার সম্ভব হয়েছে। সে কারণে, এই যে বড় প্রকল্পগুলো নির্মাণ বা শিল্প কারখানা স্থাপনে আমাদের প্রকৌশলীরা কাজ করতে পারছেন। এটা কিন্তু এক দিনে সম্ভব হয়নি। এটার জন্য বারোটি বছর বঙ্গবন্ধুকন্যার সংগ্রাম করতে হয়েছে।**

এখানে এসেছে। আইবির ১৮ কেন্দ্র এবং ৩২টি উপকেন্দ্র আছে। সেই সঙ্গে ২৩টি দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি আছে। আমরা কিছুদিনের মধ্যেই ওয়াশিংটনের অ্যাকর্ড পেতে যাচ্ছি। আমরা এখন প্রাথমিক সদস্য। যার মাধ্যমে আমাদের প্রকৌশলীরা বিশ্ববাজারে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। আমি মনে করি, এটা আমাদের এক দিনের অর্জন নয়। আমার বহু দেশে, যেমন আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইউরোপের অনেক দেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। আমাদের প্রকৌশলীরা যে তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম না কিংবা প্রকৌশল দক্ষতায় কাছাকাছি, আমি কিন্তু সেটা দেখেছি। এবং তারাই এখন বলে যে, তোমরা নিজেরা এখন অনেক সক্ষম। সেখান থেকে আইবির মাধ্যমে টেকনোলজি ট্রান্সফার সম্ভব হয়েছে। সে কারণে, এই যে বড় প্রকল্পগুলো নির্মাণ বা শিল্প কারখানা স্থাপনে আমাদের প্রকৌশলীরা কাজ করতে পারছেন। এটা কিন্তু এক দিনে সম্ভব হয়নি। এটার জন্য বারোটি বছর বঙ্গবন্ধুকন্যার সংগ্রাম করতে হয়েছে।

**প্রশ্ন:** সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে, ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে দেয়া মতামত কতটা গুরুত্ব পেয়েছে?

**প্রকৌশলী আবদুস সবুর:** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আইবি'র লাইফটাইম মেম্বার ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সম্মানীয় আজীবন সদস্য। তিনি সবসময় আমাদের কনভেনশনে এসেছেন। আমাদেরকে অনেক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, কীভাবে উনি আগামীর বাংলাদেশকে দেখতে চান। তাঁর কিছু চিন্তাভাবনা আছে সেটাও আমরা নিয়েছি। পাশাপাশি, বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা কিংবা স্থায়িত্ব আরো কীভাবে বাড়ানো যায়, সে বিষয়টি আমরা আইবির রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা আমাদের ৫৩তম কনভেনশনে চট্টগ্রাম যান, যখন পদ্মা সেতু থেকে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন বন্ধের ঘোষণা দেয়। আমি তখন আইবির মহাসচিব। তিনি তখন দ্বিধাহীন কণ্ঠে এবং দেশের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে আমাদের কাছে জানতে চান, আমার ইঞ্জিনিয়াররা যদি প্রযুক্তি সহায়তা দিতে পারে, আমি সেক্ষেত্রে নিজের টাকায় পদ্মা সেতু করবো। আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি, আইবির সাবেক প্রেসিডেন্ট, আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরীকে। বঙ্গবন্ধুকন্যা উনাকে ডেকেছিলেন। স্যার প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছিলেন, আমরা পারবো। তাই আমি মনে করি, বর্তমানে আমাদের যে সক্ষমতা আছে, তা দিয়ে যেকোনো কাঠামো নির্মাণ করার জন্য আমরা যথেষ্ট। আজ পৃথিবী একটা গ্লোবাল ভিলেজ, পৃথিবী আমাদের হাতের মুঠোয়। ফলে কোনো কিছুই এখন অসম্ভব না। আর গেলো পঞ্চাশ বছর আমরা বহুদূর এসেছি। বড় প্রকল্প থেকে শুরু করে সবকিছুই কিন্তু সম্ভব হয়েছে আমাদের প্রকৌশলীদের কারণে।

**প্রশ্ন:** আপনি জাতীয় রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত। বর্তমানে আপনার কাজের ক্ষেত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। সেখান থেকে রাষ্ট্রকে কীভাবে সেবা দিচ্ছেন?

**প্রকৌশলী আবদুস সবুর:** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক হিসেবে আমরা কয়েক দিন আগে ছয়টি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছি। সেগুলোর মধ্যে প্রথমটিই হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির। এর নেতৃত্বে আছেন এই জগতের বিশেষজ্ঞ ড. মাহফুজুল হক। তিনি সিলিকন ভ্যালিতেও সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষজ্ঞ দলের প্রধান পিডিবির সাবেক চেয়ারম্যান প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ। তেমনি জ্বালানির ক্ষেত্রে সুফি-ফারুকসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. হোসেন মনসুরকে রেখেছি। সড়কে ড. সাইফুল আমিন, তিনি আন্তর্জাতিক মানের বিশেষজ্ঞ, বিশেষ করে জাপানে উনার ব্যাপক সুনাম রয়েছে। পদ্মা সেতুর বহু অংশের ডিজাইনও তার করা। আবার রেলে আমরা এক্সপার্ট করেছি প্রফেসর জব্বারকে। আমার গ্রাম আমার শহর এবং অবকাঠামোর ক্ষেত্রে আমরা দায়িত্ব দিয়েছি প্রফেসর মুনাজ আহমেদকে।

আমি মনে করি, এইসব ক্ষেত্রে যদি আমরা আমাদের বিশেষজ্ঞ মতামত দিতে পারি, সরকার এবং দল আরো এগিয়ে যাবে। শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরে সব ধরনের প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে কীভাবে আরো দেশকে এগিয়ে নেয়া যায়, সেটাই আমাদের মূল্য লক্ষ্য।

**প্রশ্ন:** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আগামী দিনের পরিকল্পনা কী?

**প্রকৌশলী আবদুস সবুর:** এই প্রযুক্তিকে আমরা আমাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে চাই। বিশ্বের যেকোনো অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে আমরা আত্মস্থ করতে চাই। এজন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর কন্যা যে ভিশন-মিশনে কাজ করেছেন যে, ডেল্টাপ্ল্যানের বাংলাদেশ, উন্নত বিশ্বেও বাংলাদেশ, সেটি বাস্তবায়নেই কিন্তু আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক আলাদা আলাদা টিম করেছি, বঙ্গবন্ধুর চিন্তাভাবনাকে সামনে রেখে, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, সভা, সিম্পোজিয়াম কিংবা গবেষণার মাধ্যমে যে পরামর্শ বেরিয়ে আসবে, আমি মনে করি সেটা অনেক বেশি কার্যকর হবে। একটা উদাহরণ দিতে চাই, আজকে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম রেললাইন যদি সরাসরি ডাবল ট্র্যাকে করে দিতে পারি, আমাদের জিডিপি কিন্তু ২ শতাংশ বাড়তে পারে।

এই যে আমাদের চিন্তাভাবনাগুলো আমরা সরকারের কাছে দিতে চাই। মিনিমাম কস্ট, ম্যাক্সিমাম বেনিফিট আমরা দিতে চাই। কীভাবে আমাদের দেশীয় প্রযুক্তি আমাদের উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে সেটা নিয়ে আরো বেশি কাজ করতে চাই। আজকের এই বিদ্যুৎকে কীভাবে আরো পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই করা যায়, সেটাও আমরা ভাবছি। তারপরে আমার গ্রাম আমার শহরের যে ধারণা সেটা বাস্তবায়নে কম খরচে কী ধরনের অবকাঠামোর মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা দেয়া যায়, সেগুলোও আমাদের চিন্তাভাবনায় আছে। তারপর জ্বালানি থেকে, আমাদের গ্যাস শেষ হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে বিকল্প কী আছে, সে বিষয়টা আমরা অ্যাড্রেস করতে চাই। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রেও আরো নতুনত্ব আনবো। আগামীর বাজেটে যেন আরো বেশি মানুষকে সম্পৃক্ত করতে পারি, সেটিও আমাদের ভাবনায় আছে। অর্থাৎ আমাদের বহুমাত্রিক চিন্তাভাবনাকে সরকারের সামনে তুলে ধরে একটা জনবান্ধব উন্নয়ন আমরা নিশ্চিত করতে সরকারের সঙ্গে আরো বেশি নিবিড়ভাবে কাজ করতে চাই।

আমাদের নিজস্ব একটা রিসার্চ সেল আছে। গুজবসহ বিভিন্ন বিষয় মনিটরিংয়ে সেটা কাজ করছে। সেখানে আমরা আরো আধুনিকায়ন করতে চাই। আজকের যে টেলিমেডিসিন, সেটা কিন্তু আমাদেরই আবিষ্কার। জয় বাংলা অ্যাপস বিশ্বে এটিই প্রথম, একটা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে কীভাবে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া যায়, সেটা আমরা করেছি। আমাদের মধ্যে বিশ্বমানের প্রযুক্তিবিদ, প্রকৌশলীরা আছেন বলেই কিন্তু আমরা এগুলো করতে পারছি।

# দারিদ্র্য দূর করার যুদ্ধে জয় এনেছে যে প্রকৌশল

**স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল দারিদ্র্য। কোটি কোটি মানুষের জন্য কাজ ও খাদ্যের সংস্থান করাটা হয়ে উঠেছিল দুরূহ। দারিদ্র্য বিমোচনের নতুন এই যুদ্ধে বড় বাধা ছিল গ্রামের সঙ্গে শহরের ভঙ্গুর যোগাযোগ। কিন্তু দেশীয় প্রকৌশলীদের দর্শন ও কর্মপ্রচেষ্টায় গত তিন দশকে এই বাধা অনেকটাই উতরে গেছে বাংলাদেশ। সোয়া লাখ কিলোমিটার পাকা রাস্তা হয়েছে গ্রামে, গড়ে উঠেছে হাজার হাজার সেতু। এভাবে শহরে যাবার সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যের দুয়ারও খুলে গেছে গ্রামের মানুষের। গ্রামীণ দারিদ্র্য কমেছে, বেড়েছে শিল্পায়ন, আর তার সঙ্গে কাজের সুযোগ। পড়ুন, কোটি মানুষের ভাগ্য কীভাবে বদলে দিল সেই প্রকৌশল দর্শন...**

তিস্তা পাড়ে শীতটা এখন একটু বেশিই জেঁকে ধরে, নভেম্বর-ডিসেম্বরে। নদীর পানিও শুকিয়ে যায়, আরো প্রকট হয়ে। তবু চরের ফসল কিংবা ঘরের খাবার নিয়ে আর চিন্তায় পড়তে হয় না, সত্তরোর্ধ্ব মঞ্জু মীরকে। উত্তরের জনপদ, জলঢাকায় বসতি তার। সেখান থেকেই মুঠোফোনে বলছিলেন, গেল কয়েক দশকে কীভাবে জীবন আর জীবিকা বদলেছে তাদের। "আশ্বিন-কার্তিক মাসের দিকে, দিনে ১০ টাকাও আয় হতো না। নিজের জমি কিছু ছিল না। দিনমজুরি করতাম। কিন্তু কাজ তো ছিল না।"

মঞ্জু মীরের বাড়িতে মোট ছয়জন সদস্য। বৃদ্ধ মা, স্ত্রী আর তিন ছেলে মেয়ে। এত মুখের খাবার কোথা থেকে আসবে, সেই চিন্তাতেই তাদের দিন পার হতো। "জঙ্গল থেকে বউ কচুর তরকারি, এনে জ্বাল দিয়ে দিতো তা-ই খেতাম, দিনের পর দিন। সাত দিনে এক দিন ভাত জুটতো, তা-ও কেউ পেট ভরে খেতে পারতাম না। কোনো বেলায় গমের ছাল কিংবা ধানের গুঁড়া ভেজে পানি দিয়ে খেয়ে দিন পার করতে হতো," বলছিলেন মঞ্জু।

**অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুরের মতে, এই পরিবর্তনের বড় কারণ উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। বিশেষ করে সড়ক যোগাযোগ। তার চোখে, যমুনার বুকে বঙ্গবন্ধু সেতুই ওই অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচন আর মঙ্গা নিরসনে বড় ধরনের গতি এনেছে।**

তাদের সেই অভাবের দিন এখন ফুরিয়েছে। দুই ছেলেই কৃষি মজুরি করে, কিছু জমির মালিক হয়েছেন। নাতিরা সবাই স্কুল-কলেজে পড়ছে। বড় ছেলে মাসুম মীরের মোবাইল ফোন থেকেই কথা হচ্ছিল তাদের সঙ্গে। ছেলেও বাবার কথার সঙ্গে যোগ করে বললেন, "সেই সময়ের কষ্টের কথা এখনকার ছেলেমেয়েরা বুঝতেও পারে না। তাদের কাছে গল্প মনে হয়। এখন তো তিন বেলাই ভাত খাই। সকালে রুটিও খাই মাঝেসাঝে; তরকারিতে মাছ, মাংস থাকে। পান্তা এখন শখ করে খাই। মঙ্গার কোনো চিহ্নই নাই।"

মাসুম মীরের মুখে যে মঙ্গার কথা উঠে এলো; একসময় সেই মঙ্গার নামেই পরিচিত ছিল দেশের উত্তরবঙ্গ। বিশেষ করে সেখানকার পাঁচ জেলা-রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধার সঙ্গে মঙ্গা শব্দটি ছিল পরিপূরক। খাদ্যের অভাব বা মৌসুমি দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিকে বোঝাতে মঙ্গা শব্দটি ব্যবহার করা হতো। আবহমানকাল ধরে আশ্বিন-কার্তিকে ওই অঞ্চলে কোনো ধরনের কাজ থাকত না। ফলে বন্ধ হয়ে যেত পরিবারের আয়, দেখা দিতো চরম দারিদ্র্য।

নব্বইয়ের দশকেও প্রতিবছর মঙ্গা দেখা দিতো উত্তরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে। বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও মঙ্গা নিয়ে একেবারে শুরুর দিকে গবেষণা করেছেন অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর রহমান। তাঁর গবেষণায় দেখা যায়, যেখানে এই মঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ রংপুর, সেই অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে শস্যের ভান্ডার। তাহলে এই খাদ্য ঘাটতির ব্যাখ্যা কী? ড. জিল্লুর গবেষণায় দেখতে পান, মঙ্গার অন্যতম বড় কারণ অবকাঠামোর ঘাটতি।

তবে পরিস্থিতি যে এখন একেবারে বদলে গেছে, তার খবর তো আগেই মিলেছে জলঢাকার মীরদের সঙ্গে ফোনালাপে। শুধু জলঢাকা নয়, নীলফামারীর ডিমলা বা কুড়িগ্রামের চিলমারী, রৌমারীর মতো মঙ্গার 'হটস্পটগুলো' এখন আমূল পাল্টে গেছে। বছরের পুরোটা সময়জুড়ে মাঠে ফসল থাকে। প্রত্যন্ত গ্রামেও শ্রমিকের মজুরি দিনে ২৫০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত। এসব অঞ্চলের মজুর বা শ্রমিক এলাকায় কাজ না জুটলেই সোজা ঢাকার পথ ধরেন। নারীরা তো আরো আগে এসেছেন রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানাগুলোতে, অর্থনীতির বড় শক্তি হয়ে। অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুরের মতে এই পরিবর্তনের বড় কারণ, উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। বিশেষ করে সড়ক যোগাযোগ। তার চোখে, যমুনার বুকে বঙ্গবন্ধু

*যমুনা সেতু। ছবি: ইন্টারনেট*

**প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী সেই সময় এমন একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা করেছিলেন, যা সব ঋতুতে ব্যবহার উপযোগী থাকে। এরই অংশ হিসেবে ১৯৯০ সালে এলজিইডি বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল আরএস মৌজা ম্যাপ বা ডিজিটাল বেস ম্যাপ তৈরি করে। যার উপর ভিত্তি করে, পল্লী সড়ক ও গ্রামের বাজার ব্যবস্থা চিহ্নিত করা হয়।**

*প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রকৌশলী ড. কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী*

সেতুই ওই অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচন আর মঙ্গা নিরসনে বড় ধরনের গতি এনেছে। কেননা এর ফলে ঢাকার সঙ্গে উত্তরের জেলাগুলোর যোগাযোগ আর পণ্য পরিবহন বেড়েছে। বড় হয়েছে বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য। রংপুরের পরিবহন ব্যবসায়ীদের দেয়া তথ্য মতে, বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের আগে রংপুর থেকে ঢাকায় দৈনিক ৮ থেকে ১০টি বাস আসতো। এখন দুই শতাধিক বাস আসা যাওয়া করে।

সড়কপথের উন্নয়ন শুধু রাজধানীর সঙ্গেই উত্তরের মানুষের যোগাযোগ বাড়ায়নি, এসব এলাকার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগও বেড়েছে। আর এখানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করেন ড. হোসেন জিল্লুর। তিনি বলছিলেন, "পল্লী সড়ক সম্প্রসারণে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সামনের সারিতে।"

উত্তরাঞ্চলের চার জেলা রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধায় ১৯৯৫ সালের পর থেকে প্রায় ৪ হাজার ১০০ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালের আগে এই চার জেলায় মাত্র ৭২০ কিলোমিটার পাকা সড়ক ছিল।

*গ্রামের রাস্তা। ছবি: ইন্টারনেট*

পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সাবেক সদস্য এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. আবদুল মজিদ বলেছেন, "পল্লী এলাকায় দারিদ্র্য কমানো, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, শিক্ষাসহ সামাজিক নানা সূচকে বাংলাদেশ যে সাফল্য দেখিয়েছে, তাতে গ্রামীণ সড়ক, সেতু, যোগাযোগ ও পরিবহন অবকাঠামোর অবদান অনবদ্য।"

আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পল্লী অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য কমানো ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দর্শন নিয়ে কাজ শুরু করেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর প্রয়াত প্রধান প্রকৌশলী ড. কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী। তার নেতৃত্বে দেশব্যাপী প্রকৌশলীরা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তখন বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন।

এই বিপ্লবের সামনের সারির একজন যোদ্ধা প্রকৌশলী শহিদুল হাসান। তিনি ৩৩ বছর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে কাজ করেছেন। দায়িত্ব পালন করেছেন সংস্থাটির প্রধান প্রকৌশলী হিসেবেও। তিনি বলছিলেন, কীভাবে আশির দশকের শুরুতে গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়নে, তারা নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। "সমস্যাটা চিহ্নিত ছিল, সমাধানের কৌশলটিও জানা ছিল। ছিল না শুধু তা বাস্তবায়নের সক্ষমতা। তা অর্জন করতেই স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের যাত্রা শুরু," জানান প্রকৌশলী শহিদুল।

অবশ্য এলজিইডি প্রতিষ্ঠার আগ থেকেই প্রকৌশলীরা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইং'-এর মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু করে। এর মূল ভিত্তি ছিল বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির গবেষণালব্ধ "কুমিল্লা মডেল"; যেখানে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির পূর্বশর্ত হিসেবে অবকাঠামো উন্নয়নকে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

প্রকৌশলী শহিদুল হাসান বলেন, "কুমিল্লা মডেলের চারটি কর্মসূচির

মধ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামোতে বেশি জোর দেয়া হয়। কারণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া কোনো উন্নয়নই টেকসই হবে না। তখন সময়টা এমন ছিল, গুদামের খাবার আছে, কিন্তু পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে অন্যস্থানের মানুষ হয়তো সেই খাবার পাচ্ছে না।"

প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী সেই সময় এমন একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা করেছিলেন, যা সব ঋতুতে ব্যবহার উপযোগী থাকে। এরই অংশ হিসেবে ১৯৯০ সালে এলজিইডি বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল আরএস মৌজা ম্যাপ বা ডিজিটাল বেস ম্যাপ তৈরি করে। যার উপর ভিত্তি করে, পল্লী সড়ক ও গ্রামের বাজার ব্যবস্থা চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে প্রকৌশলীরা নতুন করে কোনো পথ গ্রামের মানুষের উপর চাপিয়ে দেননি বরং দীর্ঘদিন ধরে গ্রামবাসী যেসব কাঁচা পথ ব্যবহার করেছেন, সেগুলোকেই পাকা করার ব্যবস্থা করেছেন।

এই কাজ করতে গিয়ে শত শত রাত দেশের বিভিন্ন প্রান্তিক জনপদে কাটিয়েছেন প্রকৌশলী শহিদুল। সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তিনি বলেন, "তখন রাস্তার অবস্থা এত খারাপ ছিল যে, কোনো রাস্তার কাজ দেখতে গেলে সেখান থেকে দিনে ফিরে আসা যেত না। ১০ কিলোমিটার পথ আসতে তিন-চার ঘণ্টা লেগে যেতো। কিছু পথ বাসে, কিছু পথ মোটরসাইকেল, কিছুটা বাইসাইকেল, কখনো গরুর গাড়ি কিংবা শুধু হেঁটে অনেক মাইল পাড়ি দিয়ে রাস্তার কাজের জন্য যেতে হতো। গ্রামে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। তার মধ্যেই কাজ করেছি। গাড়িতে সব সময় কোদাল আর কাঠের টুকরা রাখতাম। কারণ গাড়ি নিয়ে গেলে তা মাটিতে আটকে যেতো।"

তাদেরই তিন দশকের শ্রমে দেশে এখন গড়ে উঠেছে ৩ লাখ ১০ হাজার কিলোমিটারের পল্লী সড়ক নেটওয়ার্ক, যার ৪০ ভাগই পাকা। সরকারি হিসবে, ১৯৯০ সালে গ্রামে পাকা সড়ক ছিল সাড়ে ৮ হাজার কিলোমিটার। এখন তা ১ লাখ ২৮ হাজার কিলোমিটার ছাড়িয়েছে। সড়ক বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমেছে দারিদ্র্যের হারও। খানা আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী, ২০০৫ থেকে ২০১০ এর মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা প্রায় সাত শতাংশ কমেছে। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ড. মজিদ বলেছেন, "সড়ক হওয়ায় পরিবহন ব্যয় কমে যায় এবং কৃষি-অকৃষি পণ্যের দাম বেড়ে যায়। এতে আয় ও নতুন কাজ সৃষ্টি হয়, যার প্রভাবে দারিদ্র্যও কমে যায়।"

আর ড. হোসেন জিল্লুর এই সড়ক নেটওয়ার্কের প্রভাবকে তুলে ধরেছেন এভাবে: "ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে অর্থনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। কিন্তু পল্লী সড়ক না থাকলে তো গ্রামীণ নারীরা ক্ষুদ্রঋণের অর্থ কাজে লাগাতে পারতেন না। তাদের সেখানেই থেমে থাকতে হতো। আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ক্ষেত্রেও একই বিষয় কাজ করেছে। আমাদের তো খাদ্যসহ বাকি সহায়তাগুলো গ্রামে নিয়ে যেতে হবে। কীভাবে নেবো, যদি যোগাযোগই না থাকে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় আমাদের যে অগ্রগতি হয়েছে, তা-ও এসেছে এই পল্লী সড়কের পথ ধরে। কারণ শিক্ষক গ্রামে গেছে। শিক্ষার্থীরা শহরের বিদ্যালয়ে এসেছে এই পথ ধরে।"

> **"ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে অর্থনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। কিন্তু পল্লী সড়ক না থাকলে তো গ্রামীণ নারীরা ক্ষুদ্রঋণের অর্থ কাজে লাগাতে পারতেন না। তাদের সেখানেই থেমে থাকতে হতো। আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ক্ষেত্রেও একই বিষয় কাজ করেছে।"**
> ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, অর্থনীতিবিদ

## গ্রামে সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলাফল

সূত্র: বণিক বার্তা

২০০৬ থেকে ২০১১ সালে সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে ইস্টার্ন বাংলাদেশ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট নামের একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এর প্রভাব মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিশ্বব্যাংক দেখতে পায়, প্রকল্প শেষ হওয়ার পর দুই বিভাগে অন্তত ৯৫% সুবিধাভোগীর আয় বেড়েছে। নতুন কাজ সৃষ্টি হয়েছে সিলেটে শতকরা ৫৯ ভাগ, চট্টগ্রামে শতকরা ৭০ ভাগ।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর আরেক

*বাগেরহাটের মোংলায় রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল*

গবেষণায় দেখা যায়, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের একটি প্রকল্পের শুরুতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় মাঝারি মানের দারিদ্র্যের হার ছিল শতকরা ৫৭ ভাগ, যা প্রকল্প শেষে ৪৮ শতাংশে নেমে আসে। একইভাবে সেখানে অতিদারিদ্র্যের হারও ৬% কমে গেছে, মানুষের সঞ্চয়ও বেড়েছে; যা প্রকল্পের বাইরে থাকা গ্রামগুলোতে হয়নি। ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের মতে, সারাদেশে যে ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন অর্থনীতি ছিল, সেটাকে একটি জাতীয় রূপ দিয়েছে, এলজিইডির পল্লী সড়কগুলো। তিনি বলেন, "এই কাজগুলো আশির দশকের শেষ থেকে এবং পরবর্তীকালে হয়েছে। তার মাধ্যমে গ্রামীণ ও জাতীয় অর্থনীতির অনেকগুলো পূর্বশর্ত পূরণ হয়েছে। আর এটি হয়েছে প্রকৌশলীদের হাত ধরেই।"

সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি শুধু গ্রামীণ অর্থনীতিকেই ত্বরান্বিত করেনি। এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছে দেশের শিল্পায়নকেও। ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ-ভালুকা সড়ক ধরে এগোলে, দুই পাশে শুধু নতুন নতুন শিল্প কারখানা চোখে পড়বে। প্রতি মাসেই নতুন নতুন বিনিয়োগ হচ্ছে, এই সড়ক আর সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি প্রকৌশলী মুনীর উদ্দিন বলেন, 'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ৯০ দশকের পর থেকে দেশে যে শিল্পের বিকাশ ঘটেছে, তার বড় কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি। বিশেষ করে যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের পর, উত্তরবঙ্গে আমরা অনেক শিল্প কারখানা চালু হতে দেখেছি। তখন ওই সেতুর উদ্যোগ না নেয়া হলে, হয়তো উত্তরবঙ্গ এখনো অনেক পিছিয়ে থাকতো।"

বাংলাদেশে যত রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল স্থাপন হয়েছে, একটি

**বাংলাদেশে যত রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল স্থাপিত হয়েছে, একটি ছাড়া এর সবগুলোই হয়েছে ১৯৯০ এর পরে। বিশেষ করে, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পরে। কেননা সে সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য বেশকিছু বড় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায়, ১৯৯৯ সালে বাগেরহাটের মোংলায় রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা হয়।**

ছাড়া এর সবকটিই হয়েছে ১৯৯০ এর পরে। বিশেষ করে, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পরে। কেননা সে সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য বেশ কিছু বড় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায়, ১৯৯৯ সালে বাগেরহাটের মোংলায় রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা হয়। এসব শিল্পাঞ্চল পরিচালনাকারী সংস্থা বেপজা জানিয়েছে, যখনই যে ইপিজেডের সঙ্গে সংযুক্ত সড়ক অবকাঠামোর উন্নতি হয়েছে, সেখানেই উদ্যোক্তারা নতুন নতুন কারখানা স্থাপনা করেছেন। বিনিয়োগ বেড়েছে, হয়েছে কর্মসংস্থান।

বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশের প্রকৌশলীরা তাদের মেধাকে অভিনব এবং সৃজনশীল প্রকৌশলে রূপান্তর করেছেন। চাহিদা আর বাস্তবতার নিরিখে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সব অবকাঠামো নির্মাণ করেছেন, যার ফলে সেগুলো থেকে দেশ আর দেশের মানুষও উপকৃত হয়েছে, হচ্ছে নিরন্তর।

# উন্নয়নের সামনের সৈনিক প্রকৌশলীরা

প্রকৌশলী নূরুল হুদা

## সাক্ষাৎকার

**প্রকৌশলী নূরুল হুদা, বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশের বর্তমান সভাপতি। দায়িত্ব পালন করেছেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর চেয়ারম্যান হিসেবে। তবে তার সবচেয়ে বড় পরিচয়, তিনি ১৯৭১-এর মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। সক্রিয় ছিলেন, ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে। কাছ থেকে দেখেছেন স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশ পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াও। দীর্ঘ আলাপচারিতায় তুলে ধরেছেন আগুনঝরা সেসব দিনের কথা। জানিয়েছেন দেশের প্রকৌশল শিক্ষা আর প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে আইইবি'র অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা...**

**প্রশ্ন:** আপনি যখন কলেজের ছাত্র, তখন থেকে আপনি সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। কীভাবে জড়ালেন রাজনীতির সঙ্গে...

**প্রকৌশলী নূরুল হুদা:** ১৯৬৫ সালের কথা। আমি তখন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। আমাদের বাসা তখন বর্তমান ভূতের গলি যেখানটাতে, সেখানে। ওখানে একটা স্কুল ছিল ধানমন্ডি স্কুল। ওই স্কুল মাঠে, একদিন ধানমন্ডি থানা আওয়ামী লীগের সম্মেলন আয়োজন করা হলো। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ওই দিন প্রথম আমি শেখ সাহেবকে দেখি। তার ভরাট কণ্ঠের বক্তৃতা শুনি। সেই বক্তৃতা শুনে এতটাই আকৃষ্ট হই যে, তখনই কলেজে গিয়ে আমি ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যোগ দেই। তখন রাজিউদ্দিন রাজু সাহেব জগন্নাথ কলেজের ভিপি ছিলেন। তার নেতৃত্বে আমি জগন্নাথ কলেজের সাহিত্যবিষয়ক সম্পাদক হই। পরবর্তী পর্যায়ে, ১৯৬৮ সালে আমি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। ১৯৬৯-এ যখন এগারো দফা আন্দোলন শুরু হলো, আমি তখন বুয়েটে ছাত্রলীগের সক্রিয় রাজনীতি করি। ওই সময় আমি সোহরাওয়ার্দী হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই। তখন আমাদের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইডেন কলেজের ভিপি ছিলেন। সে সময় থেকেই নেত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয়। শেখ কামাল ভাই ঢাকা কলেজে পড়তেন, তখন তার সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল, দেখা করতে বিভিন্ন সময়ে ৩২ নম্বরের বাসায় যেতাম। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৯ সালে ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগর কমিটির সম্মেলন হয়। সম্মেলনে যে কমিটি হয়, আমিও সেই কমিটিতে ছিলাম। সেই কমিটি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ৩২ নম্বরের বাসায় দেখা করতে গেলে তিনি আমাদের নাশতা করার জন্য ৫০০ টাকা দিয়েছিলেন।

**প্রশ্ন:** তারই ধারাবাহিকতায় কী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ?

**প্রকৌশলী নূরুল হুদা:** যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ১৯৭০ এর নির্বাচনের পরপরই। যখন পাকিস্তানিরা ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে তালবাহানা শুরু করলো, দলের হাইকমান্ড বুঝলো যুদ্ধ অনিবার্য। তখন ঢাকা শহরের ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের ত্যাগী ও আন্তরিক কর্মীদের দিয়ে একটি দল গঠন করা হলো। আমিও ওই কমিটিতে ছিলাম। আমাদের প্রতিদিন রাত ১১টা/১২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসুতে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। কমান্ডার সুলতান সাহেব আমাদের সেই ট্রেনিং করাতেন।

এরপর যখন ৭ মার্চ জনসভার ঘোষণা আসলো। আমরা আগের দিন, অর্থাৎ ৬ মার্চ রাতে বুয়েটের হলে হলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নিয়ে মিছিল করলাম। ঘোষনা দিলাম, পরের দিন সকাল ৯টায় আমরা জনসভার উদ্দেশে রওনা হবো। তো পরদিন সকালে, সব হল থেকে ছাত্ররা এসে জড়ো হলো বর্তমান তিতুমীর হলের সামনে। সেখান থেকে আমরা মিছিল নিয়ে তৎকালীন রেসকোর্সে গেলাম। আমরা বুয়েটের ছাত্ররা, একদম সামনের দিকে বসেছিলাম। জনসভাস্থলে মঞ্চের সামনে যে বাঁশের

ব্যারিকেড ছিল, আমরা ঠিক তার সামনেই বসেছিলাম। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার পরে আমরা বুয়েটে চলে আসলাম। বুয়েটে সব ছাত্র যে যার হলে চলে গেলো। আমি যে হলের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম, সেই হলের তৎকালীন নাম ছিল পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর নামে। তার একটা ছবি ছিল, হলের অফিস কক্ষে। আমি সেই ছবিটা খুলে, বাইরে মাঠে নিয়ে এসে সবার সামনে পুড়িয়ে দিলাম এবং হলের নাম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হিসেবে ঘোষণা করলাম। ওই দিনই আমরা পলাশী থেকে কাপড় কিনে এনে রং দিয়ে হলের নতুন নাম টাঙিয়ে দিলাম। সেই থেকে ওই হলটির নাম সোহরাওয়ার্দী হল। স্বাধীনতার পর অবশ্য তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসর ইউসুফ আলী সাহেব এসে আনুষ্ঠানিকভাবে নামফলক উন্মোচন করেন।

**প্রশ্ন:** আর মুক্তিযুদ্ধে কবে গেলেন...

**প্রকৌশলী নূরুল হুদা:** ৭ মার্চের জনসভার পরপরই ঢাকা শহরের ছাত্রলীগের সব ইউনিটের নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দেয়া হলো নিজ নিজ এলাকায় চলে যেতে। যাতে আমরা যুদ্ধের আগাম প্রস্তুতি নিতে পারি। ১২ মার্চ আমি ফেনীর দাগনভূঞা চলে গেলাম। সেখানে আমরা ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়ে জনমত সৃষ্টি করলাম। গ্রামের বাজারগুলোতে তরুণদের সঙ্গে মতবিনিময় করতাম। বঙ্গবন্ধুর বার্তা পৌঁছে দিতাম। তখন আমাদের এমপি ছিল খাজা আহমেদ সাহেব। তার নেতৃত্বে আমরা ফেনীতে এই কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করলাম। পরে ২৫ মার্চ পাকিস্তান মিলিটারি আক্রমণ করলে, খাজা আহমেদের নেতৃত্বে যুদ্ধ অংশ নিতে আমরা ভারতে চলে যাই। এরপর টানা ৯ মাস যুদ্ধ করি মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আদর্শকে সামনে রেখে। এরপর ১০ জানুয়ারি যখন বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসেন, আমি সেখানেও উপস্থিত ছিলাম।

**প্রশ্ন:** তাহলে তো আপনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটাকে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া বেশ কাছ থেকে দেখেছেন...

**প্রকৌশলী নূরুল হুদা:** হ্যাঁ, সেই সৌভাগ্য হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা বাংলাদেশের অনেক ব্রিজ, কালভার্ট ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। যাতে পাকিস্তান আর্মি সহজে যাতায়াত না করতে পারে। মানুষ নিরাপদে থাকতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধু সেসব সড়ক, ব্রিজ আবার সংস্কারের দিকে নজর দেন। এই সংস্কারের জন্য বঙ্গবন্ধু বুয়েটের তৎকালীন উপাচার্য মহোদয়কে ডেকে পাঠান। দ্রুত সময়ের মধ্যে এই সড়ক অবকাঠামোকে পুনর্গঠন এবং পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। তিনি সিনিয়র শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনেরও নির্দেশ দেন। তখন বুয়েটের উপচার্য ছিলেন নাসের সাহেব। আর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রধান ছিলেন ড. হাসনাত। ভিসি মহোদয় তার সঙ্গে আলাপ করলেন। তখন ড. শাহজাহান, ড. আজিজ, ড. ইউসুফজাই; ওনাদেরকেও এই কাজে সম্পৃক্ত করা হলো। এরপর তখনকার দিনের ইস্ট পাকিস্তান রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে ডিপার্টমেন্ট ও পিডব্লিউডির চেয়ারম্যানদেরও ওই কমিটিতে নেয়া হলো। ব্রিজগুলোকে পুনর্গঠনের জন্য যে ডিজাইন দরকার, কমিটি সেগুলো করলো এবং তা বাস্তবায়নের জন্য রোডস অ্যান্ড হাইওয়েকে দায়িত্ব দেয়া হলো। এরপরেই পূর্নগঠনের মূল কাজ শুরু হয়ে গেলো। আর বড় বড় ব্রিজের ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডার আহ্বান করা হলো। টেন্ডার করে সেগুলোকে সংস্কার করা হলো। এর বাইরে নতুন কিছু ব্রিজের কাজও শুরু হলো, যেমন ঢাকা চট্টগ্রাম রোডে তিনটা নতুন ব্রিজের কাজ হলো, একটি কাঁচপুরে, একটি দাউদকান্দিতে, আরেকটি মেঘনায়। এগুলোতে আগে ফেরি চলতো। এই নির্মাণ কাজের নেতৃত্ব দিল কিন্তু ওই কমিটি। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দও কিন্তু বড় ভূমিকা রেখেছেন এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায়। রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে, পিডব্লিউডিসহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় এর সদস্যরা ছিলেন। তারাই কিন্তু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই

**মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা বাংলাদেশের অনেক ব্রিজ, কালভার্ট ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। যাতে পাকিস্তান আর্মি সহজে যাতায়াত না করতে পারে। মানুষ নিরাপদে থাকতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধু সেসব সড়ক, ব্রিজ আবার সংস্কারের দিকে নজর দেন।**

কমিটিকে সহায়তা করেছেন।

**প্রশ্ন:** ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কীভাবে দেশ পুনর্গঠনের এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হলো?

**প্রকৌশলী নূরুল হুদা:** ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের ফরমেশনটা হয় পাকিস্তান আমলে। ১৯৪৮ এর ৭ মে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকেই এটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। মরহুম প্রকৌশলী এম এ জব্বার এই উদ্যোগটি গ্রহণ করেন। এর প্রধান কার্যালয়ও ঢাকাতে ছিল। তখনকার দিনে সব বড় বড় প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। শুধু ব্যতিক্রম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই তখনকার নেতৃবৃন্দ সংগঠনের সংবিধান পরিবর্তন করেন। তখন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করে। পরবর্তী সময়ে এই ইনস্টিউটের নেতৃবৃন্দ এবং বুয়েটের ওই কমিটি একসঙ্গে কাজ করে, স্বাধীন বাংলাদেশে অবকাঠামো উন্নয়নের কর্মকান্ড এগিয়ে নিয়ে যান। কারণ তখন একটা ভ্যাকিউমের আশংকা তৈরি হয়েছিল। স্বাধীনতার আগে পূর্ব বাংলার যে রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে বা পিডব্লিউডি ছিল, সেখানে অনেক পাকিস্তানি প্রকৌশলী কাজ করতো। তারা যুদ্ধ শুরুর সময়ই পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে যায়। আমাদের প্রকৌশলী যারা ছিলেন, তারাই পরবর্তী সময়ে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আর বঙ্গবন্ধুও প্রকৌশলীদের ওপর অনেক নির্ভর করেছিলেন। তিনি তার সরকারে, সাতজন প্রকৌশলীকে সচিব পদমর্যাদায় নিয়োগ দিয়েছিলেন। তারা কিন্তু এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় বড় অবদান রেখেছিলেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

**প্রশ্ন:** অবকাঠামো খাতের এই উন্নয়ন যাত্রাটা কেমন ছিল?

**প্রকৌশলী নূরুল হুদা:** দেশের এই যে উন্নয়নের ধারা সেটি কিন্তু মূলত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তার সরকারের আমলেই শুরু হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ঘাতকের বুলেটে নিহত হবার আগ পর্যন্ত প্রচণ্ড গতিতে সেই কার্যক্রম চলেছে। আর এ কারণেই কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি অল্প সময়ের মধ্যে ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে। কিন্তু ৭৫-এর পট পরিবর্তনের পর, যেসব সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তারা সেইভাবে উন্নয়নের প্রক্রিয়াটা এগিয়ে নেয়নি। তারা নিজেদের নতুন দল গঠনে ব্যস্ত ছিল। ফলে দেশের উন্নয়ন সেভাবে হয়নি। এরপর, ৯০-এ দেশে গণতন্ত্র ফিরলেও উন্নয়নের চাকা গতি পায় ১৯৯৬ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় এলে। আর ২০০৯-এ তিনি দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বড় ধরনের গতি পায়। যার উদাহরণ হয়ে আছে পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন। অথচ এই সেতু প্রকল্প কিন্তু আরো অনেক আগে বাস্তবায়িত হতে পারতো। ২০০১ সালে এই সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। তখনও তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সেসময় জাইকাকে দিয়ে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষাও করা হয়েছিল মাওয়া-জাজিরা রুটে এই সেতু নির্মাণ নিয়ে। কিন্তু

২০০১ এ নতুন সরকার এসে সেই প্রকল্প স্থগিত করেন। তখনকার যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদা জাইকাকে আবারো সম্ভাব্যতা যাচাই করতে বলেন। এই প্রক্রিয়ায় প্রায় পাঁচ বছর কেটে যায়। জাইকা নতুন রিপোর্টে আগের মতোই মাওয়া প্রান্তে সেতু করার পরামর্শ দেয়। পরে ২০০৯ এ বর্তমান সরকার প্রথম মেয়াদে ক্ষমতায় এসে আবারো পদ্মা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। আর এখন তো পদ্মা সেতু দৃশ্যমান।

শুধু সড়ক অবকাঠামো নয়, আপনারা মনে করে দেখবেন, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ আর ২০০১ থেকে ২০০৬ এই সময়ে, ঢাকা শহরেও টানা দুই ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকতো না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই পরিস্থিতির বদল এনেছেন। বিদ্যুৎ সেক্টরে ৯৫ শতাংশ সফলতা এসেছে। বড় বড় মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। তার বাস্তবায়নও হচ্ছে সফলভাবে। এই উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলোর সব উদ্যোগই কিন্তু ২০০৯ থেকে ২০২০ এর মধ্যে নেয়া হয়েছে। যার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।

**প্রশ্ন:** বর্তমান এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট কীভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে?

**প্রকৌশলী নূরুল হুদা:** বর্তমানে দেশের ৬০ হাজারের বেশি প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের সদস্য। যারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সরকারের এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আছেন। উন্নয়ন কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এর বাইরে ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আমরা নিয়মিত সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আয়োজন করি, নির্দিষ্ট বিষয়াবলির ওপরে। সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ সব মতামত আসে, যা সরকারের নীতিতে প্রতিফলিত হয়।

সরকারের প্রকৌশল সংশ্লিষ্ট যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের মতামত চাওয়া হয়। আমাদের বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীরা সেসব বিষয়ে সরকারকে সহায়তা করেন। পদ্মা ব্রিজ থেকে শুরু করে সকল মেগা প্রজেক্টে আমাদের বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীরা কাজ করেছেন, সংশ্লিষ্ট থেকেছেন। রাজউকের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকাকালীন আমরা যখন ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান নিয়ে কাজ করছিলাম, তখন কিন্তু আমি আইইবির কাছে তাদের পরামর্শ চেয়েছি। তারা পৃথক কমিটি করে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়েছে। এখনও আবার রাজউক থেকে এমন একটি মতামত চাওয়া হয়েছে। শুধু রাজউক নয়, এলজিইডিসহ সরকারের সব মন্ত্রণালয়ে আমরা নিয়মিত আমাদের বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়ে থাকি।

**প্রশ্ন:** প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট কী ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে?

**প্রকৌশলী নূরুল হুদা:** প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে আমাদের চার ধরনের কর্মসূচি আছে। একটি হলো ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ। এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ারিং ফাউন্ডেশন ট্রেনিংসহ নানাবিধ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। এই কার্যক্রম বছরজুড়েই চলে। যাতে আমাদের প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সে জন্যই এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। একই সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনা কমিশনে যে সিপিটিইউ আছে, সেখানকার অনলাইন টেন্ডারিংয়ে ট্রেনিংও আমরা দিয়েছি। আমাদের একটি অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড আছে। এটি আমাদের একটি বড় কার্যক্রম। যার মাধ্যমে আমরা দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের মান যাচাই করি। তাদেরকে সনদ প্রদান করি। আমাদের অ্যাক্রিডিটেশন ছাড়া, তাদের শিক্ষার্থীরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কোনো পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে না। সে কারণে, এই মূল্যায়নটি সারাবছর চলে। আমাদের বিশেষজ্ঞরা সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে যান, তাদের কারিকুলাম, ক্ল্যাস-ল্যাবরেটরিসহ সকল সুযোগ সুবিধা, যাচাইবাছাই করে যদি দেখে সেটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন, তখনই কেবল অ্যাক্রিডিটেশন দেয়া হয়। এর বাইরে, আমাদের প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার্স রেজিস্ট্রেশন বোর্ড আছে। যেটি বুয়েটের একজন প্রাক্তন অধ্যাপকের নেতৃত্বে কাজ করছে। প্রতি ছয় মাস পরপর আমাদের এই রেজিস্ট্রেশন বোর্ডের পরীক্ষা হয়। সেখানে যারা পাস করেন, তাদের প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার্স হিসেবে সনদ দেয়া হয় এবং এই সনদ আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। আরেকটি হচ্ছে আমাদের সেফটি বোর্ড। এই বোর্ডের কাজ হচ্ছে সরকারের যেসব শিল্প কল-কারখানা আছে সেগুলো পরিদর্শন করা এবং সেখানকার নিরাপত্তা বিষয়ে মতামত দেয়া। এইভাবে আমাদের চারটা অর্গান, সরকারের সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে যুক্ত থেকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের বিকাশে অবদান রাখছে।

**প্রশ্ন:** প্রকৌশলীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে আইইবির উদ্যোগের কথা বললেন। স্থানীয় প্রকৌশলীদের দক্ষতার মান এখন কেমন?

**প্রকৌশলী নূরুল হুদা:** একটা উদাহরণ দিলেই এর উত্তর পরিষ্কার হবে। আমাদের পদ্মা সেতুর প্রকল্প পরিচালক হচ্ছেন শফিকুল ইসলাম। শফিক সাহেব রোডসের অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। সেখান থেকে উনি ডেপুটেশনে গিয়েছিলেন সেতু বিভাগে। সেখান থেকে তাকে পদ্মার প্রকল্প পরিচালক করা হয়। এত বড় প্রকল্পে উনি পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। সেখানে তাকে পরামর্শক হিসেবে যারা সহায়তা করছেন, তারা কিন্তু বেশির ভাগই রোডসের অবসর প্রাপ্ত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী। তারা মনিটরিং এবং সুপারভিশনের কাজটি দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। পদ্মা সেতুর ডিজাইন করেছে একম নামের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু নির্মাণের পুরো তত্ত্বাবধায়ন আমাদের দেশিয় প্রকৌশলীরা করেছেন। তার মানে কী, সক্ষমতা অর্জন করেছেন বলেই তারা এটা করতে পেরেছেন। চীনের যারা কাজ করছেন, তাদের সঙ্গে কিন্তু পাল্লা দিয়ে আমাদের পরামর্শকরা কাজ করে চলেছেন। তার মানে হচ্ছে, আমরা যেকোনো আন্তর্জাতিক কাজের জন্য সম্পূর্ণভাবে সক্ষম। আমাদের এখানে ৬০টির মতো পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আছে, তারা এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কাজও করছে। এর বাইরে সরকারের যে বিভাগগুলো আছে, যেমন সড়ক, সেতু, রেল কিংবা বিদ্যুৎ সেখানকার প্রকৌশলীরা কিন্তু নিজ নিজ সংস্থায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রতিনিয়তভাবে কাজ করছেন।

এই প্রেক্ষাপটে আমি বলতে চাই, এই কোভিড-১৯-এর পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, কোভিড মোকাবেলা প্রথম কাতারের সৈনিক হলো ডাক্তার এবং নার্সসহ স্বাস্থ্যকর্মীরা। আর আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের দরবারে আজকে বাংলাদেশকে যে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিণত করেছেন, সেই রোল মডেলকে অর্থাৎ ভিশন ২০২১, ভিশন ২০৪০ এবং ডেল্টা ২১০০' কে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকৌশলীরা সামনের সৈনিক। বাংলাদেশের সকল প্রকৌশলীকে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের সকল সদস্যকে আমি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সততার সঙ্গে, দক্ষতার সঙ্গে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য এবং তাঁর উন্নয়নের যে ধারাবাহিকতা সেটাকে বজায় রেখে নিজ নিজ অবস্থান থেক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ সব সময় সরকারের পাশে আছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পাশে আছে। আগামী দিনেও ইনশাল্লাহ আমরা তার পাশে থেকে এদেশের উন্নয়নের কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাবো।

**বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের দরবারে আজকে বাংলাদেশকে যে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিণত করেছেন, সেই রোল মডেলকে অর্থাৎ ভিশন ২০২১, ভিশন ২০৪০ এবং ডেল্টা ২১০০'কে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকৌশলীরা সামনের সৈনিক।**

# লকডাউনে সচল, দুর্যোগেও অটল

মহামারির প্রথম চার মাসে লকডাউন ও চলাচলে বিধিনিষেধের কারণে গোটা দেশই কার্যত থমকে গিয়েছিল। কিন্তু এই সময় ইন্টারনেট, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানিসহ জরুরি সব ধরনের সেবাই সচল রেখেছেন দেশের হাজার হাজার প্রকৌশলী...

১৫ ফুট বা ২০ ফুটের একটি ঘর। সেখানেই বসবাস ১২ জনের। টেবিল-চেয়ার সরিয়ে মেঝেতেই শয্যার আয়োজন হয়েছে সারি করে। বাথরুমে নেই গোসলের ব্যবস্থা। এর মাঝেই টানা ৬৬ দিন পার করেছেন প্রকৌশলী নাজির হোসেন। ইন্টারনেট সংযোগ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে তাকে কাজ করতে হয়েছে রাতদিন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে।

দেশে করোনা যখন ছড়াতে শুরু করে তখন ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান আম্বার আইটির কারিগরি বিভাগের কর্মীরা এভাবেই সেবা দিয়ে গেছেন তাদের গ্রাহকদের। ২১ জনের এই দলে ৬ জনই ছিলেন প্রকৌশলী। প্রতিদিন অন্তত ২০টি পয়েন্টে সেবা দিতে হতো দলটিকে। এপ্রিল-মের সেই গরমে কাজ শেষে অফিসে ফিরে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজের সময়, বিড়ম্বনা ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী।

"এমন গ্রাহকের বাসায়ও যেতে হয়েছে, যেখানে তারা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে গোসল করিয়ে ঘরে ঢুকিয়েছে। প্রচন্ড মানসিক চাপ হতো। দীর্ঘ সময় পরিবারের বাইরে, শুধু ফোনে কথা হতো। মাঝে মাঝে ভিডিও কল। আবার কবে দেখা হবে, আদৌও দেখা হবে কি না কিছুই জানতাম না। তারপরও মেনে নিয়েছিলাম সব, পেশার স্বার্থে," করোনার প্রথম চার মাসের অভিজ্ঞতা এভাবেই বর্ণনা করেন নাজির।

মহামারির প্রথম চার মাসে লকডাউন ও চলাচলে বিধিনিষেধের কারণে গোটা দেশই কার্যত থমকে গিয়েছিল। কিন্তু এই সময় ইন্টারনেট, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানিসহ জরুরি সব ধরনের সেবাই সচল রেখেছেন দেশের হাজার হাজার প্রকৌশলী। ফ্রন্টলাইনার বা সম্মুখসারির যোদ্ধা হিসেবে মহামারিতে চিকিৎসক, পুলিশ, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষের কর্মকান্ড আলোচিত হয়েছে অনেক। কিন্তু রাতদিন ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা, নাজিরের মতো প্রকৌশলীদের অবদান আড়ালেই রয়ে গেছে। একইভাবে আলোচনার বাইরে রয়ে গেছেন এই পেশার আরো শত শত তরুণ

*লকডাউনের সময় রাজধানী ঢাকা। ছবি: ইন্টারনেট*

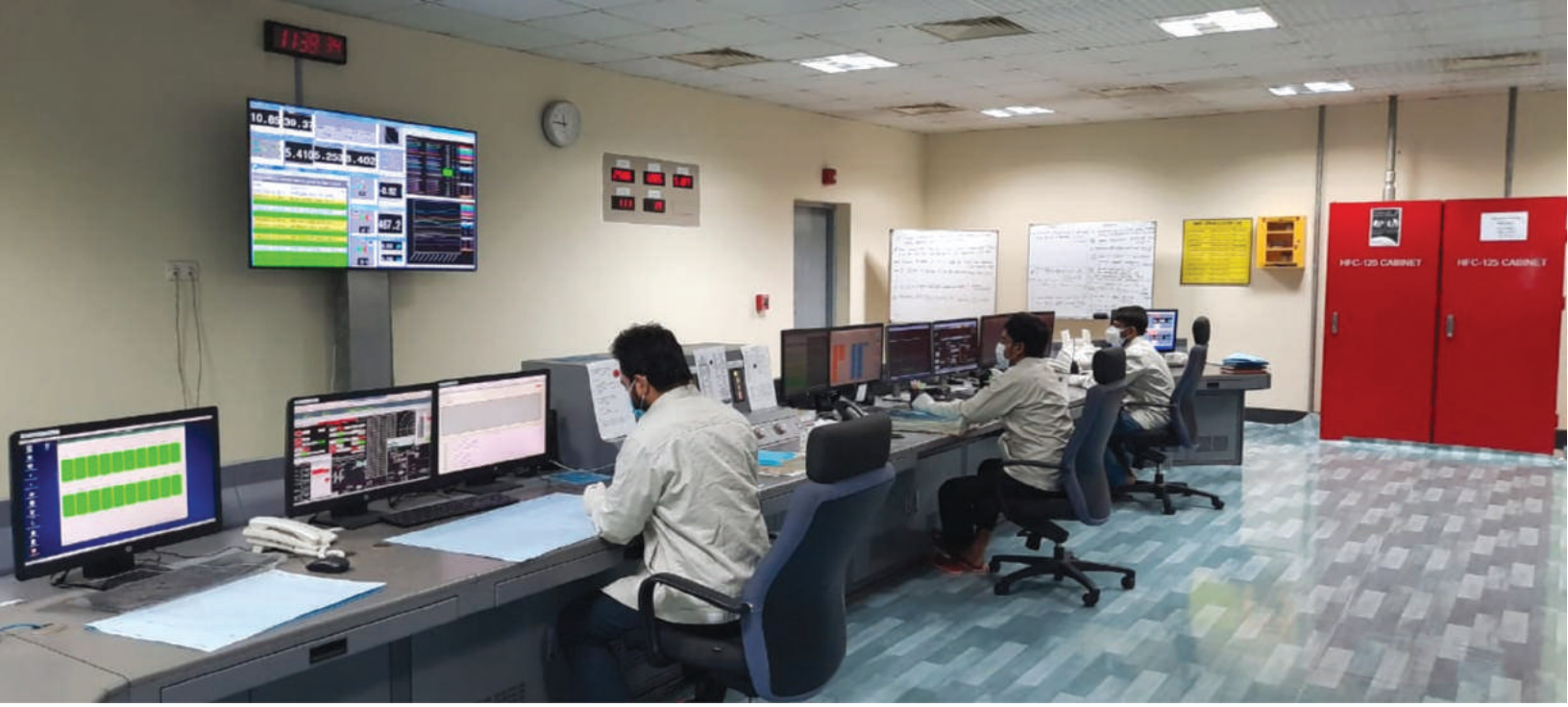

*লকডাউনের সময় ইন্টারনেট সচল রাখতে ব্যস্ত প্রকৌশলী। ছবি: ইন্টারনেট*

কর্মী, যারা করোনার মধ্যেও ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করে গেছেন নিজেদের জীবন বা কোনো রকম স্বীকৃতির তোয়াক্কা না করেই।

### ইন্টারনেট যেভাবে সচল ছিল

করোনার প্রথম কয়েক মাস শহরের রাস্তায় চলাচল থেমে গেলেও মানুষের যোগাযোগ থামতে দেননি এই প্রকৌশলীরা। অফিস চলেছে ঘর থেকে, মানুষ সভা-সেমিনারে অংশ নিয়েছে অনলাইনে, চলেছে স্কুলের পড়ালেখা, থামেনি বাজার সদাইও। বরং মহামারির প্রথম ছয় মাসে অনলাইনভিত্তিক ব্যবসা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের খবর অনুযায়ী, কোভিডের প্রথম তিন মাসে ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার ৮০ শতাংশ এবং কার্ডে লেনদেন প্রায় দেড় গুণ বেড়েছে। এই সময়টাতে গোটা দেশ যে ডিজিটাল বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে, তা মূলত নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবার কারণে।

করোনার প্রাদুর্ভাবে মার্চের শেষ সপ্তাহে, সরকার দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। তখন আইএসপি কোম্পানিগুলোতে কাজের চাপ উল্টো আরো বেড়ে যায়। "যখন থেকে লকডাউন শুরু হলো, কাজের চাপ বাড়ছিল। বিভিন্ন স্থানে নেটওয়ার্ক মেরামত, নতুন সংযোগ স্থাপনের কাজ আসতে শুরু করলো। কিন্তু চলাচল তো বন্ধ, নিরাপদও না। তাই সিদ্ধান্ত হলো কারিগরি বিভাগের কর্মীরা অফিসে থাকবে," বলছিলেন আম্বার আইটির সহকারী ব্যবস্থাপক নাজির।

সংকটের সময়ে পরিবারের বদলে, নিজের পেশাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এপ্রিলের দশ তারিখে তারা ওঠেন অফিসে। নাজির জানান, রান্না, খাওয়া, ঘুম-সবই অফিসে; আর গ্রাহেকের ডাক এলেই পিপিই'সহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম পরে কাজে যেতে হতো।

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এবং বিটিআরসি'র হিসাবে, করোনার প্রথম কয়েক মাসে দেশের বাসাবাড়িতে ইন্টারনেট ব্যবহার দ্বিগুণ বেড়ে যায়। মোবাইল ফোনেও ডেটার ব্যবহার ২০ ভাগ বাড়তে দেখা যায়। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি আমিনুল হাকিম জানান, সেই মাসগুলোতে গ্রাহকসেবার চাপ বেড়ে

**"সংকটের মধ্যেও বাড়তি এই চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়েছে, এ খাতের জড়িত প্রকৌশলী আর কারিগরি কর্মীদের জন্য।"**

**আমিনুল হাকিম,** সভাপতি, আইএসপিএবি

যাওয়ায় তাদেরকে আউটসোর্সিংও করতে হয়েছে। তিনি বলেন, "সংকটের মধ্যেও বাড়তি এই চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়েছে, এ খাতের জড়িত প্রকৌশলী আর কারিগরি কর্মীদের জন্য।"

### কোথাও কেন আলো নেভেনি

কোভিড মহামারি কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি করেছিল প্রকৌশলী পিয়াস হোসেনকে। ঘরে সন্তানসম্ভবা স্ত্রী একা। অথচ কাজের প্রয়োজনে তাকে থাকতে হবে ঘর ছেড়ে দূরে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রে। পিয়াস, হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী।

মার্চের শেষ সপ্তাহেই তাকে স্থায়ীভাবে চলে আসতে হয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আইসোলেন সেন্টারে। সেখান থেকেই ১২ ঘণ্টা পালা করে কাজ করেছেন। তবে কেন্দ্রের ভেতরে থাকায় আর কাজের চাপ বেশি থাকায় প্রস্তুত থাকতে হয়েছে ২৪ ঘণ্টাই। এভাবে চলেছে প্রায় চার মাসেরও বেশি সময়।

"প্রচন্ড আতংকিত থাকতাম। পরিবারের জন্য উদ্বিগ্ন থাকতাম। তারপরও কিছু করার ছিল না। কাজের জন্য আসতে হবে, তাই নিজেকে মোটিভেট করতাম। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভেতরে যারা ছিলাম, আমরা একজন আরেকজনকে সাহস দিতাম, যে দেশের হয়ে কাজ করছি," করোনায় নিজের অভিজ্ঞতা বলছিলেন পিয়াস। কেন্দ্র থেকে মাত্র চার কিলোমিটারের দূরত্বে থাকলেও, কোভিডের ওই সময়ে, তিনি পরিবারের কাছে ফিরতে পারেননি।

পিয়াসের মতো ২৫ জন প্রকৌশলীসহ মোট ৫০ জনের একটি কারিগরি দল কোভিড-১৯-এর সময় সাধারণ ছুটি টানা কাজ করেছে হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে। ৪১২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি রাজধানীর বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই

*লকডাউনের সময় সারা দেশে বিদ্যুৎ ছিল সচল। ছবি: ইন্টারনেট*

লকডাউনেরও বাড়তি সব প্রস্তুতি নিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ কামরুজ্জামান বলছিলেন, "এখানে প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানদের দল হয়ে কাজ করতে হয়; সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অতটা সহজ নয়। একজনের যদি কেন্দ্রের ভেতরে করোনা পজিটিভ হয়, তাহলে তা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়বে এবং কেন্দ্র সচল রাখা যাবে না। সেই ভাবনা থেকে আমরা কর্মীদের আইসোলেশনের ব্যবস্থা করি। সবাইকে বাসা থেকে, কেন্দ্রের ভেতরে এসে বসবাসের নির্দেশনা দেয়া হয়।"

কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার সরঞ্জাম দেয়া হলেও, সেই সময়টাতে তাদের মনোবল ঠিক রাখা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বলে উল্লেখ করেন কামরুজ্জামান। "কর্মীদের বলতাম, হয়তো আমাদের ফ্রন্টলাইনার বলা হচ্ছে না, কিন্তু আমরাও করোনা ফাইটার। যদি আমরা কাঙ্ক্ষিত বিদ্যুৎ সরবরাহ না করতে পারি। যদি হাসপাতালগুলোতে সামান্যও বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়, তাহলে বড় সংকটের সৃষ্টি হবে। আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে, এমন যেন কিছু না ঘটে এবং আমরা সফল হয়েছি," বলেন এই প্রকৌশলী।

সরকারি হিসাবে, এখন বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা সাড়ে ২৩ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। এর বিপরীতে চাহিদার নিরিখে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ উৎপাদন হয়েছে ১৩ হাজার মেগাওয়াটের মতো। করোনার সময় শিল্প কল-কারখানা আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এই চাহিদা আরো দুই হাজার মেগাওয়াটের মতো কমে আসে। হিসাব বলছে, এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত গড়ে দশ হজার মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুতের চাহিদা ছিল দেশে, যা নিরবচ্ছিন্নভাবেই সরবরাহ করা গেছে সংকটের এই সময়েও।

দেশে বিদ্যুত উৎপাদন ও ব্যবহারের তুলনামূলক কোনো পরিসংখ্যান এখানে দেয়া যাবে, যেখান থেকে বোঝা যায় করোনায়ও বিদ্যুৎ সেবায় কোনো ঘাটতি হয়নি? থাকলে এখানে দুই লাইন যোগ করা জরুরি।

**হিসাব বলছে, এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত গড়ে দশ হজার মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুতের চাহিদা ছিল দেশে, যা নিরবচ্ছিন্নভাবেই সরবরাহ করা গেছে সংকটের এই সময়েও।**

### গ্যাসের চুলো নেভেনি

সেবা নিরবচ্ছিন্ন রাখতে উদ্যোগ ছিল বাকি সব পরিষেবা সংস্থার পক্ষ থেকেও। যেমন তিতাস গ্যাস। তাদের জন্য সাভার এলাকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, সেখানকার সব কারখানাই তাদের গ্রাহক। বিশেষ করে, ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর কারখানা। এর বাইরে আরো প্রায় ৬০ হাজার আবাসিক গ্রাহক আছে, তিতাসের সাভার এলাকায়। কোভিড মহামারির কারণে দেশজুড়ে চলা সাধারণ ছুটির মধ্যেও গ্রাহকদের ২৪ ঘণ্টা সেবা দিতে হয়েছে সেখানে কর্মরত ৭০ থেকে ৮০ জন কর্মীকে। তাদেরই একজন সহকারী ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী সুমন দাস। তিনি জানান, 'কোভিডের কারণে বেশির ভাগ

*উপকূলীয় বাঁধ সচল রেখেছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীরা। ছবি: ইন্টারনেট*

মানুষ ঘরে ছিলেন, তাই সেখানে গ্যাসের চাহিদা বেড়েছে। আবার অনেক কলকারখানা বন্ধ ছিল, সেখানে চাহিদা কমে গেছে। তাই প্রেশার ম্যানেজ করতে হয়েছে প্রতিনিয়ত। কোথায় কেমন গ্যাসের চাপ সেটা মনিটরিং করতে হয়েছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে।"

এর বাইরেও বিল তৈরি করে, ঝুঁকি নিয়ে, সেগুলো গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে হয়েছে তিতাসের কর্মীদের। "দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের এই সেবা সেভাবে কারো নজরে আসেনি। করোনাকালে সেবা দেয়ার জন্য আমাদের কোনো স্বীকৃতিও মেলেনি। প্রতিশ্রুতি থাকলেও, কোনো প্রণোদনা আমরা পাইনি, সংকটের সময়ে জরুরি সেবা দেওয়ার জন্যে," বলেন সুমন।

শিল্প কারখানায় যে পরিমাণ গ্যাস ব্যবহৃত হয়, তার বড় অংশই যায় দেশের স্টিল মিলগুলোতে। করোনার সময়ও অনেক কলকারখানা কমবেশি সচল ছিল। বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফেকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ বলেন, 'কোভিড চলাকালীন বিদ্যুৎ-গ্যাসের মতো পরিষেবা আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবেই পেয়েছি। যখনই বিদ্যুৎতে কোনো সমস্যা হতো বা গ্যাসের প্রেশার কমে যেত, তারা যথাযথভাবেই সেই সেবাগুলো দিয়ে গেছে। এতে কোনো সন্দেহ নাই, এই সেবার সঙ্গে কাজ করা মানুষগুলো ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা। তবে একটা ব্যত্যয় ঘটেছে। তারা জুন-জুলাইয়ে, আগের মাসগুলোর গড় হিসাব ধরে অনেক বাড়তি বিল করেছিল। এখন অবশ্য সেগুলো সমন্বয় করা হচ্ছে।'

### যারা দুর্যোগে ভয় পাননি

কোভিড মহামারির মধ্যেই দেশে কয়েক দফায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। ঘূর্ণিঝড় আমপান থেকে শুরু করে বন্যা পর্যন্ত, বিভিন্ন দুর্যোগ থেকে মানুষকে নিরাপদ রাখতে বরাবরের মতো কাজ করেছেন প্রকৌশলীরা; বিশেষ করে পানি উন্নয়ন বোর্ডের।

**"একদিকে করোনার আতংক, এর সঙ্গে আমপান আর টানা বন্যা, সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে আমাদের প্রকৌশলীরা মাঠে ময়দানে কাজ করেছেন। অনেক ঝুঁকি নিয়ে তারা পোল্ডার রক্ষা করেছেন, ক্ষতিগ্রস্তগুলো পুনর্বাসন করেছেন।"**

**ড. মিজানুর রহমান**, প্রধান প্রকৌশলী
উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প

পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবেলা, দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় কাজ করে থাকে। তাদের তৈরি উপকূলীয় বাঁধ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে জনজীবন ও সহায়-সম্পদ রক্ষা করে।

পাউবো জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় আমপানে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বাঁধগুলো হুমকির মুখে পড়ে, অনেক ক্ষয়ক্ষতিও হয়। এ সময় জানমাল রক্ষায় কোভিড-আতংক মাথায় নিয়ে কাজ করে গেছেন পাউবোর মাঠপর্যায়ের প্রকৌশলীরা।

উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান প্রকৌশলী ড. মিজানুর রহমান বলেন, "একদিকে করোনার আতংক, এর সঙ্গে আমপান আর টানা বন্যা, সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে আমাদের প্রকৌশলীরা মাঠে ময়দানে কাজ করেছেন। অনেক ঝুকি নিয়ে তারা পোল্ডার রক্ষা করেছেন, ক্ষতিগ্রস্তগুলো পুনর্বাসন করেছেন।"

ঘূর্ণিঝড়ের পরে, তিন মাসের বেশি সময় পার হয়ে গেলেও, এখনো সাতক্ষীরাসহ উপকূলের অনেক স্থানেই তারা বাঁধের মেরামতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। "এখনো শীতের মধ্যেই অনেক প্রকৌশলী বাঁধের উপরে বসবাস করছে। একেকজন তরুণ প্রকৌশলীর চেহারা দেখলে আপনারা ভয় পাবেন। সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তারপরও কাজ

করে চলেছে," মাঠপর্যায়ের প্রকৌশলীদের আন্তরিকতা আর ত্যাগের কথা এভাবেই তুলে ধরেন মিজানুর রহমান।

এই সাময়িকীর জন্য দেয়া সাক্ষাৎকারে হাওরের সর্বশেষ বন্যা নিয়েও কথা বলেন এই প্রকৌশলী। জানান, শুধু হাওরের বন্যা থেকে বাঁধ রক্ষা নয়, কোভিডে শ্রমিক সংকট দেখা দেওয়ায়, এবার কৃষকদের ধানও কেটে দিয়েছেন মাঠপর্যায়ের প্রকৌশলীরা। একই ভাবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ঢুকে পড়া নোনা পানি পরিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তারা কাজ করেন বলে তিনি জানান।

**সামাজিক দায়বদ্ধতা**

নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে, নিষ্ঠা আর দক্ষতার সঙ্গে পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রকৌশলীরা করোনার এই সময়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সামাজিক অঙ্গীকার নিয়েও। করোনা-ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারের কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী আর বেগবান করতে, প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে ১০ লাখ টাকা অনুদান দেয়া হয় প্রকৌশলীদের জাতীয় সংগঠন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ, আইইবির পক্ষ থেকে।

করোনার সময়ে মানুষের কাছে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে বিনা মূল্যে টেলিমেডিসিন সেবাও চালু করে আইইবি। এর অংশ হিসেবে, ৩৪ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার; যাদের অনেকেই আবার প্রকৌশলী পরিবারের সদস্য বিনামূল্যে প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে সেবা প্রদান করেছেন রোগীদের। এই কার্যক্রমে অংশ নেয়া চিকিৎসকদের পরবর্তীকালে সম্মাননাও দিয়েছে আইইবি।

আইইবি'র সাবেক সভাপতি প্রকৌশলী আবদুস সবুরের মতে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়িত হওয়ার কারণেই, কোভিডের এই সময়ে টেলিমেডিসিনের মতো সেবাগুলোর মাধ্যমে অসুস্থ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া সম্ভব হয়েছে।

*আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের 'নো মাস্ক নো সার্ভিস' কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ*

তিনি বলেন, "সারা বিশ্ব কোভিডে আক্রান্ত, বাংলাদেশও তার বাইরে না এবং আমাদের প্রকৌশলী সমাজও এর বাইরে না। আর তাই অতীতের মতো আমরা এবারও বেশ কিছু কিছু কর্মসূচি নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি।"

*মাস্ক বিতরণ করছেন আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার*

**করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সরকারের কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী আর বেগবান করতে, প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে ১০ লাখ টাকা অনুদান দেয়া হয় প্রকৌশলীদের জাতীয় সংগঠন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ, আইইবি'র পক্ষ থেকে।**

আইইবি ঢাকা কেন্দ্রও করোনাভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা এবং সরকারের 'নো মাস্ক নো সার্ভিস' কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিনামূল্যে সর্বসাধারণের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করেছে।

আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার বলেন, "যত দিন পর্যন্ত টিকা বাজারে না আসবে তত দিন এই মাস্কই আমাদের টিকা হিসেবে অনেকটা রক্ষা করবে। আর যেহেতু সরকার ঘোষণা দিয়েছে 'নো মাস্ক নো সার্ভিস' তাই মানুষ যেন সচেতন হয়, সেই লক্ষ্যেই আমাদের কার্যক্রম।" পর্যায়ক্রমে রাজধানী বিভিন্ন এলাকাসহ আইইবি'র সারা দেশের কেন্দ্র-উপকেন্দ্রগুলোতেও মাস্ক বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এর বাইরে অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন আমেরিকা (এএবিইএ) এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে মহামারি করোনাভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন, দুঃস্থ এবং অসহায় পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করেছে আইইবি। তারা জানিয়েছে, আগামীতেও এই কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

প্রকৌশলী আবদুস সবুর বলেছেন, "প্রকৌশল পেশাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি, সমাজের প্রতি প্রকৌশলীদের দায়বদ্ধতা পালন করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। তারই অংশ হিসেবে, এই সমাজসেবামূলক কার্যক্রমগুলো আমরা পরিচালনা করি।"

## সাক্ষাৎকার

প্রকৌশলী রহমতউল্লাহ। বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত কাছে থেকে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে দিয়েছেন পরামর্শ। এই খাতে প্রযুক্তির ব্যবহারে রেখেছেন অনন্য ভূমিকা। বাড়তে থাকা খাদ্য চাহিদা মেটাতে তার সবচেয়ে বড় পরামর্শ হলো, কৃষিকে আনতে হবে পুরোপুরি প্রযুক্তির আওতায়, শিগগিরই। কৃষির উন্নয়নে এদেশের প্রকৌশলীদের অবদানকে অসমান্য উল্লেখ করে বলছেন, নতুন প্রজন্ম আরো বেশি দক্ষ, চৌকস। যাদের হাতেই বিনির্মাণ হবে আগামীর আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা...

# এখন মেধাবী ছেলেমেয়েরা কৃষি প্রযুক্তি ও প্রকৌশল পড়তে আসছে

**প্রকৌশলী রহমতউল্লাহ**

**প্রশ্ন:** ১৯৭২-এ আপনি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। সে সময়, আপনাদের দাবি এবং অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতেই বঙ্গবন্ধু কৃষি গ্র্যাজুয়েট কে চার বছর এবং ক্লাস ওয়ানের মর্যাদা দেন। সেই প্রেক্ষাপটটা একটু শুনতে চাই।

**প্রকৌশলী রহমতউল্লাহ:** ১৯৭৩-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ময়মনসিংহ গেলেন, সার্কিট হাউসে রাত্রি যাপন করলেন। ওখানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবও ছিলেন। আর ময়মনসিংহের নেতা রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া, তাদের সঙ্গে আমরা কথা বললাম। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা হলো এবং বললাম, আপনাকে কিন্তু ওই ঘোষণাটা করতে হবে যে, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের সমান কৃষিবিদদের স্ট্যাটাস হবে। আর কোর্স হতে হবে ফোর ইয়ার্স আফটার ইন্টারমিডিয়েট, ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ারদের মতোই। এবং এটা সব ফ্যাকাল্টির জন্যই করতে হবে। উনি বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে। যাও ,আমরা চিন্তা করি। সঙ্গে বললাম, একটা শহীদ স্মৃতি পাঠাগার উদ্বোধন করতে হবে; ইউনিভার্সিটির ছাত্রলীগ অফিসের ভেতরে। উনি বললেন, তোরা তো অনেক কিছু বুঝোস, কিন্তু আমি যে প্রধানমন্ত্রী, আমার ছাত্রলীগ অফিসে যাওয়া ঠিক হবে না, এটা বুঝোস না?

তখন আমি বললাম, আপনাকে তো আমরা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখি না। আপনি জাতির পিতা, আপনি বঙ্গবন্ধু। আপনি আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট। আর ছাত্রলীগেরও আপনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আপনাকে এটা করতে হবে। মিনিট খানেক চিন্তা করে বললেন, যা, ঠিক আছে দেখি। তখন উনার পিএস ছিলেন রফিকউল্লা চৌধুরী, বর্তমান যিনি স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর বাবা। তাকে ডেকে বললেন, যা, দেখ তো ওরা কী বলে? তার সঙ্গে বসলাম। কথা হলো যে, বঙ্গবন্ধু ভাষণ শেষ করে ঢাকার দিকে রওনা দেবেন ছাত্রলীগ অফিসের সামনে দিয়ে। আমরা গাড়ি থেকে তখন ওনাকে নামাবো। সেটাই হলো। উনি ছাত্রলীগ অফিসের ভেতরে ঢুকে, শহীদ স্মৃতি পাঠাগার উদ্বোধন করে ঢাকার দিকে চলে গেলেন। এখানে মজার ব্যাপার হলো, ৪-৫ দিন পরে তখনকার ভাইস চ্যান্সেলর ড. ফজলুর রহীম আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তিনজনই গেলাম। উনি বললেন, তোমাদের পাঠাগারের জন্য আমার বরাবর, মানে ভাইস চ্যান্সেলরের বরাবর বঙ্গবন্ধু ৫ হাজার টাকার একটা চেক পাঠিয়েছেন বই কেনার জন্য। দেখেন, উনি কিন্তু ছাত্রদের হাতে টাকা দেন নাই। তখন আমরা সেই টাকা দিয়ে স্বাধীনতার ওপর, বাংলাদেশের ওপর যেসব বই পাওয়া যায়, কিনলাম। যা হোক, উনার সেই ঘোষণার পর চারদিকে হইহুল্লোড় পড়ে গেলো। তখন ভালুকা রোড ছিল না। ঢাকায় যেতে হতো টাঙ্গাইল হয়ে। আমরা দুই বাস ভরে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তখনকার যে গণভবন, আজকের সুগন্ধা, মানে অতিথি ভবনে দেখা করলাম। ধন্যবাদ দিলাম। তখন উনি বললেন, আমি যা করেছি, তোদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য না। দেশকে বাঁচাতে হলে কৃষিতে ভালো ছাত্র আসতে হবে।

**প্রশ্ন:** বাংলাদেশের কৃষি যে আজকের এই অবস্থানে, তার পেছনে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে?

**প্রকৌশলী রহমতউল্লাহ:** আমার বয়স তো এখন ৭২। যখন ছোট ছিলাম, দেখতাম, আমাদের মানিকগঞ্জে বিঘায় ৪/৫ মণ ধান হতো, বছরে একবার। তখন তো প্রায় ৭ কোটি মানুষ ছিল। বহু লোক তখনও দুই বেলা বা তিন বেলা ভাত খেতে পারতো না। অনেক গরিব ছিল। এখন আঠারো কোটির ওপরে মানুষ, ভাত খেয়ে যে বেঁচে আছে, এটা কিন্তু কৃষি প্রকৌশলীদের অবদান। এখন বছরে ৩ বারও কিন্তু ধান হয়, বিঘায় ২৫

মণও পাওয়া যায়। আগে দেখতাম আমাদের মা-বোনেরা বাড়ির আনাচে-কানাচে শাকসবজি ফলাতেন। আগে যে খাল বিলে মাছ ছিল, খালবিল তো এখন শুকিয়ে গেছে। অথচ, আমরা প্রচুর মাছ খেতে পারছি। সেটা কিন্তু ফিশারিজ গ্র্যাজুয়েটদের জন্য। এভাবে গরু, হাঁস, মুরগি-সবকিছুই পাচ্ছি। এখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টা ফ্যাকাল্টি। এগুলো কিন্তু তাদের অবদান। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা এতো বেশি ছিল যে, বলতেন এই কৃষিনির্ভর বাংলাদেশ বাঁচাতে হলে, তোদের মূল্যায়ন তো করতে হবে এবং তোদেরও কষ্ট করতে হবে। এখন দেশ খাদ্যে প্রায় স্বনির্ভর। বিদেশ থেকে এখন চাল না আনলেও চলে। এখন কৃষিতে যে উন্নতি হচ্ছে, এটাও কিন্তু বঙ্গবন্ধুরই অবদান; স্বাধীনতার অবদান।

**প্রশ্ন:** কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার কী তখন শুরু হয়েছিল?

**বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা এতো বেশি ছিল যে, বলতেন এই কৃষিনির্ভর বাংলাদেশ বাঁচাতে হলে, তোদের মূল্যায়ন তো করতে হবে এবং তোদেরও কষ্ট করতে হবে। এখন দেশ খাদ্যে প্রায় স্বনির্ভর। বিদেশ থেকে এখন চাল না আনলেও চলে। এখন কৃষিতে যে উন্নতি হচ্ছে, এটাও কিন্তু বঙ্গবন্ধুরই অবদান; স্বাধীনতার অবদান।**

**প্রকৌশলী রহমতউল্লাহ:** আমার বাড়ি তো গ্রামে। তখন ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী, মন্ত্রী ছিলেন, মানিকগঞ্জের। উনার ওখানে কয়েকটা পাওয়ার ট্রিলার আনলেন তখন। আমরা স্কুলে পড়ি। সেটা দেখার জন্য ৩-৪ মাইল হেঁটে আমরা এসেছিলাম। কাজেই প্রযুক্তি ছিল খুবই কম মাত্রায়। কিন্তু এখন সেটা অনেক উঁচু মাত্রায় চলে গেছে। এখন ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে, শ্যালোর মাধ্যমে পানি দেয়া হচ্ছে। মেশিনের মাধ্যমে কম্বাইন্ড হার্ভেস্টিং করা হচ্ছে। তখন এসব ছিল না। তবে, কৃষিতে আরো উন্নতি করতে হলে পুরো খাতকে যান্ত্রিকীকরণের আওতায় আনতে হবে।

**প্রশ্ন:** এটা কতোটা জরুরি?

**প্রকৌশলী রহমতউল্লাহ:** জরুরি মানে, এটা ছাড়া তো আর উপায় নেই। তবে, এখানে একটা কথা আছে, তাহলে তো কৃষক বেকার হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আরো একটা কাজ করতে হবে। তা হলো, গ্রামে গ্রামে কৃষির ইন্ডাস্ট্রি বা শিল্প গড়ে তুলতে হবে। যাতে কেউ বেকার না হয়। আরেকটা জিনিস, অ্যাগ্রিকালচারের যে মেশিনারি, সেগুলোর দাম কিন্তু বেশি। সেগুলো প্রয়োজনে ভর্তুকি দিয়ে হলেও কৃষকের ক্রয়ক্ষমতার আওতায় আনতে হবে।

**প্রশ্ন:** বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনে কী গুরুত্ব পেয়েছিল?

**প্রকৌশলী রহমতউল্লাহ:** প্র্যাকটিক্যালি আমার মনে আছে, এখন দেশে যা হচ্ছে, যন্ত্রের মাধ্যমে কৃষি চাষ, সিডলার, ধান রোপণ করা, নিড়ানি এ ব্যাপারে কিন্তু তার ভাবনা ছিল। বঙ্গবন্ধু চিন্তা করেছিলেন, কোনো ফসল যদি উৎপাদন না করতে পারি, আমাদের না খেয়ে মরতে হবে। ধরেন, এখন আমাদের যে পপুলেশন, খোদা না করুক, কোনো একটা ফসল আমরা যদি না করতে পারি, তাহলে তো লাখ লাখ মানুষ না খেয়ে মরবে। দুনিয়ার এমন কোনো দেশ নেই, যেখান থেকে আমরা খাদ্য সংগ্রহ করে চাহিদা মেটাতে পারি।

সুতরাং, আমাদেরকে স্বস্তিতে থাকতে হলে খাদ্যের উৎপাদন আরো বাড়াতে হবে, এ ব্যাপারে ছাড় দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। এখানে দল-মতের বিভেদেরও কোনো সুযোগ নেই। সবাই মিলেই এটা করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর দর্শনও কিন্তু এ রকম ছিল।

**প্রশ্ন:** যান্ত্রিকীকরণ কিংবা উৎপাদন বাড়ানোর এই পরিবর্তনটা কখন শুরু হলো?

**প্রকৌশলী রহমতউল্লাহ:** স্বাধীনতার পর থেকেই আসলে এটা শুরু হয়েছে। আস্তে আস্তে এটা বেড়েছে। কৃষি প্রযুক্তির তিনটি মৌলিক বিষয়েই কিন্তু এখন কাজ হচ্ছে। যেমন সেচ, রাসায়নিক এবং যন্ত্রপাতি। এটা ছাড়া তো আর কোনো উপায়ও নেই। বাড়াতে হবেই।

**প্রশ্ন:** কৃষি প্রযুক্তিতে প্রকৌশলীদের ভূমিকাকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

**প্রকৌশলী রহমতউল্লাহ:** আমাদের দেশিয় প্রতিষ্ঠান বিএডিসির জন্ম হয়েছে কিন্তু কৃষির উন্নয়নের জন্য। এখানে বহু ইঞ্জিনিয়ার জড়িত। বিএডিসি ছাড়া কৃষিসংক্রান্ত সব প্রতিষ্ঠানেই অনেক প্রকৌশলী কাজ করছেন। সিভিল বলেন, মেকানিক্যাল, কেমিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল-সবাই কিন্তু এখানে জড়িত; প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে। যেমন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৪ সালে প্রথম অ্যাগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি শুরু হলো। তখন এগ্রিকালচারাল বায়াসড যে সাবজেক্টগুলো, ওইগুলো কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদের পড়ানো হতো। এভাবে অ্যাগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়াররা কিন্তু সারাদেশে বিরাট অবদান রাখছেন।

**প্রশ্ন:** এই অবদান কী প্রত্যাশিত মাত্রায় বেড়েছে?

**প্রকৌশলী রহমতউল্লাহ:** প্রত্যাশিত মাত্রায় যদি না-ও হয়ে থাকে, তারপরও অনেক হয়েছে। ১৯৬৪'র আগে কিন্তু ইরিগেশন কীভাবে হয়, মেকানিজম কি, কেউ কিন্তু জানতো না। এটা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদেরই অবদান, চোখের সামনে দেখানো এবং মানুষকে বোঝানো। আগেই তো বললাম, প্রথম পাওয়ার ট্রিলার আমি দেখেছি ৪-৫ কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে। এখন তো প্রায় সব কৃষকের হাতের কাছেই আছে। আগে শুধু দেখতাম, আমাদের সময়ে ছোট শ্যালোর মাধ্যমে পুকুর সেচে পানি দেয়া হতো ক্ষেতে।

**প্রশ্ন:** আমাদের দেশে এখনো অন্যতম সঙ্কট লাগসই প্রযুক্তির অভাব। সেই সঙ্গে দাম নিয়ে বিপাকে পড়েন কৃষক। এর কারণ কী?

**প্রকৌশলী রহমতউল্লাহ:** অত্যাবশ্যকীয় প্রযুক্তিই লাগবে আমাদের। কিন্তু দেশে এখনো খুব বেশি উৎপাদন হয় না। তাই বিদেশ থেকে আনতেই হবে। বিশেষ করে, কৃষির উন্নয়নে যেসব যন্ত্রপাতি লাগে। এখানে আমদানি হয়তো বেশি দামে করতে হবে বা বেশি দাম পড়ে যাবে। কিন্তু সরকারকে এখানে সাবসিডি দিতে হবে। না হলে কৃষক কিনতে পারবে না। আমাদের দেশের কৃষকরা গরিব। সেখানে সরকারের উচিত হবে সঠিকভাবে পরিকল্পনা করা।

এই যে ধানের দামের কথা বলি। কৃষকরা বলে, দাম পাই না। তাই আবাদও করি না। অন্যদিকে, ধানের দাম বাড়লে সাধারণ মানুষ ক্ষেপে যান। সুতরাং এখানে একটা সঙ্কট তৈরি হয়। কৃষককে ন্যায্য দাম দিতেই হবে। আবার বাজার স্থিতিশীল রাখাও জরুরি।

**প্রশ্ন:** বিদেশ থেকে প্রযুক্তি বা যন্ত্রপাতি আমদানি না করে এখানে দেশিয় প্রকৌশলীরা বানাতে পারেন কী না?

**প্রকৌশলী রহমতউল্লাহ:** অলরেডি দেশের প্রকৌশলীরা এখানে ভূমিকা রাখছেন। আমরা এখন তৈরি হয়তো করতে পারছি না। কিন্তু মেরামত করছি। সেটাও কিন্তু কম অগ্রগতি বা দক্ষতার বিষয় না। কারণ, আগে তো মেরামতের জন্যও বিদেশিদের ওপর নির্ভর করতে হতো। আসলে পাওয়ার ট্রিলার বলেন কিংবা বড় কম্বাইন্ড হার্ভেস্টর, এগুলো এখানেও ম্যানুফ্যাকচার করা যায়। সরকারের পক্ষ থেকে যদি সাবসিডি দেয়া যায়, সাহস ও নীতি সহায়তা দেয়া যায়, এখানে সফল হওয়া সম্ভব। আমাদের দেশের ইঞ্জিনিয়াররা আগের চেয়ে অনেক বেশি চৌকস। এখন ভালো, মেধাবী ছেলে মেয়েরা কৃষি প্রযুক্তি ও প্রকৌশল পড়তে আসছে। তাদেরকে নানাভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কারণ, আগের দিনের চেয়ে এখনকার অ্যাগ্রিকালচার অনেক বেশি কঠিন। কঠিন বলেই কিন্তু ভালো ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করছে।

# দেশীয় শিল্প খাত
# উদ্যোগের অগ্রভাগে, বিবর্তনের নেপথ্যে

গেল পাঁচ দশকে বাংলাদেশের শিল্প খাত আমূল বদলে গেছে। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। পুরনো দিনের পাট ও বস্ত্রকে ছাড়িয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ অবস্থান করে নিয়েছে সেরাদের কাতারে। প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প আগামীর সমৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে যাচ্ছে। দেশে উৎপাদনমুখী শিল্পের এই অতীত ও বর্তমান অর্জনে প্রকৌশলীরা কখনো অবদান রেখেছেন উদ্যোক্তা হিসেবে, আর কখনোবা পেশাজীবী হিসেবে শিল্পকে টিকিয়ে রেখেছেন নিজের মেধা ও শ্রমের মাধ্যমে। বেসরকারি খাতের সফল উদ্যোক্তা ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্রমপরিবর্তশীল প্রযুক্তির এই যুগে ভবিষ্যতের ইঞ্জিনটাকেও সচল রাখতে হবে দেশীয় এই প্রকৌশলীদেরই...

**প্রকৌশলী যখন উদ্যোক্তা**

গ্রাম থেকে উঠে আসা অতি সাধারণ এক ছাত্র তখন ভর্তির খোঁজে ছোটাছুটি করছেন ঢাকায়। চেষ্টা করেও সুযোগ হলো না বুয়েট, মেডিক্যালে ভর্তির। অবশেষে কলেজের এক বড় ভাইয়ের পরামর্শে থিতু হলেন তখনকার কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। সালটা ১৯৭৯।

পাস করার পর যুক্ত হলেন সে সময়ের নামকরা প্রতিষ্ঠান অলটেক্স-এ। তখনও বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হতো না খুব একটা। দুই বছর কাজ করার পর আর্থিক সচ্ছলতা বাড়াতে যোগ দেন ঢাকার একটা ওয়াশিং কারখানায়। এরপর ধারাবাহিকভাবে ২/৩টা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে করতে স্বপ্ন দেখতে থাকেন উদ্যোক্তা হওয়ার। ১৯৯৪ সালে চাকরির জমানো ৩ লাখ টাকায় শুরু করে স্ক্রিন প্রিন্টের ব্যবসা। সেই থেকে শুরু। বাবা, মা, সন্তান আর নিজের নামের আদ্যক্ষরে শফিকুর রহমান শুরু করেন হ্যামস নামক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে যেখানে কাজ করছেন প্রায় ১২০০ শ্রমিক। বার্ষিক রপ্তানি প্রায় ১৫ কোটি ডলার। পেশায় টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হয়েও চাকরির লোভ সামলে হয়েছেন উদ্যোক্তা। তাকে সাফল্য এনে দিয়েছে এই খাতের শিক্ষা, জ্ঞান এবং বিচার-বিশ্লেষণী ক্ষমতা। তিনি জানান, মূলত আশির দশকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররা পাস করে বের হওয়ার পর পোশাক খাতের উত্থান হয়। আর বর্তমানে বস্ত্র, পোশাক, সুতা কিংবা ওয়াশিং সব কারখানার সাফল্যের পেছনেই বড় অবদান এ

**“আমার টেক্সটাইল কারখানায় ৬টা মেশিন বানিয়েছি নিজেদের ওয়ার্কশপে। স্পেয়ার পার্টস বানাচ্ছি। পোশাক খাতে বর্তমানে প্রায় ২৫ শতাংশ কারখানায় বিদেশি কর্মী কাজ করেন, যা আগের চেয়ে অনেক কম। এটা দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারদের সহযোগিতায় হয়েছে,”**

**কুতুবউদ্দিন আহমেদ**, চেয়ারম্যান, এনভয় ও শেল্‌টেক্‌ গ্রুপ

দেশের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের। কারণ, দক্ষ লোক বাইরে থেকে এনে সবাই পুষতে পারতো না। দেশীয়রাই কিন্তু সাপোর্ট দিয়েছে। বস্ত্র ও পোশাক খাতে দেশীয় প্রকৌশলীদের অবদান বিষয়ে তিনি আরো জানান, একাডেমিক শিক্ষা থাকায়, বিদেশি ক্রেতাদের সঙ্গে সহজ হচ্ছে তাদের চাহিদা বুঝে আলাপআলোচনা করা। একই সঙ্গে, দেশীয় ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজের ব্যবসায় মিলছে বাড়তি সুবিধা। বুয়েটের বারান্দা, সবুজ ক্যাম্পাস আর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে টানা চার বছর পার করেছেন কুতুবউদ্দিন আহমেদ। ১৯৮৫ সালে পাস করে যোগ দেন চাকরিতে। কিন্তু মন টেকেনি বেশি দিন। আর্থিক সুবিধাও ছিল না খুব একটা। সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে তাই সিদ্ধান্ত নিলেন উদ্যোক্তা হওয়ার। পৈতৃক বাড়ি বন্ধক রেখে শুরু করেন তৈরি পোশাকের ব্যবসা। সে সময় রপ্তানি বাজারে কেবল পা রাখতে শুরু করেছে বাংলাদেশ। স্বভাবতই সেদিকে ঝুঁকে পড়েন তিনিও।

“আমাদের ওই সময়ে প্রায় সবাই ৯০ মেশিনের কারখানা বসানো শুরু করলেন। যার উৎপাদন ক্ষমতা ছিল দৈনিক ২ হাজার পিস। কিন্তু আমি শুরু করলাম ৪৪ মেশিন অর্থাৎ অর্ধেক ক্ষমতা দিয়ে। বড় কারখানাগুলো কোনোভাবেই তাদের সক্ষমতার ৮০ শতাংশের বেশি ব্যবহার করতো না। অন্যদিকে, আমি ব্যবহার করলাম শতভাগের ওপরে; কারণ আমার প্রকৌশল দক্ষতা এবং জ্ঞান আমার জন্য বাড়তি সুবিধা ছিল,” বলেন কুতুবউদ্দিন। তিনি মনে করেন, প্রকৌশল-শিক্ষা তাকে যেকোনো বিষয় বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করেছে এবং এখান থেকে তিনি বাড়তি আত্মবিশ্বাসও পেয়েছেন।

প্রায় ২১ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান করা এনভয় গ্রুপের চেয়ারম্যান কুতুবউদ্দিন আহমেদ একসময় নেতৃত্ব দিয়েছেন পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর। এই শিল্পকে গড়ে তোলার শুরুর দিকের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, “প্রথম দিকে ব্যবসার সিংহভাগই একাই সামলাতাম। যখন কোনো অফিসে গিয়ে আমার কার্ডটা দিতাম, সবাই বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার দেখে একটু বেশি সমীহ করতো।”

কুতুবউদ্দিন মনে করেন, দেশের ইঞ্জিনিয়াররা সব সময়ই ব্যবসা বিমুখ, তারা চাকরিতেই বেশি আগ্রহী, তাই ঝুঁকি নিতে চান না। কিন্তু পেছনে থেকে শিল্পের প্রসারে তাদের অবদানের কথা স্বীকার করে নেন এই উদ্যোক্তা। “আমার টেক্সটাইল কারখানায় ৬টা মেশিন বানিয়েছি নিজেদের ওয়ার্কশপে। স্পেয়ার পার্টস বানাচ্ছি। পোশাক

*এনভয় টেক্সটাইলের কারখানা*

খাতে বর্তমানে প্রায় ২৫ শতাংশ কারখানায় বিদেশি কর্মী কাজ করেন যা আগের চেয়ে অনেক কম। এটা দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারদের সহযোগিতায় হয়েছে,” বলেন তিনি।

রপ্তানি আয়ের প্রধান ভিত্তি পোশাক খাতের এমন অসংখ্য উদ্যোক্তার হাতেই আজ শক্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি, যা টেনে নিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। গেলো ২০ বছরের বিনিয়োগ এবং ব্যবসার ধরন বিস্তৃত হচ্ছে বহুমাত্রিক খাতে। যাতে, আরো নিবিড় অংশগ্রহণ বাড়ছে সব শ্রেনির প্রকৌশলীদের।

### অর্থনীতির বিবর্তনে প্রকৌশলীরা

১৯৮২ সালে যাত্রা শুরু করে এনার্জিপ্যাক। বর্তমানে, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত প্রায় সব ধরনের পণ্যই এখন উৎপাদন করছে তারা। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পাওয়ার গ্রিডসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রায় ৫০০ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে নিজেদের তৈরি পণ্যে। দেশি-বিদেশি বাজার মিলিয়ে যারা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আয় করেছে ১৫ কোটি ডলার। প্রতিষ্ঠানটির

*এনার্জিপ্যাক কারখানা*

এই সাফল্যের পেছনে বড় ভূমিকা এখানে কাজ করা ৩০০ প্রকৌশলীর, যাদের বেশির ভাগই দেশীয়।

প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী রবিউল আলম বলেন, "এনার্জিপ্যাকের চার দশকের ক্রমবিকাশে বাংলাদেশি প্রকৌশলীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের মেধা, সৃজনশীলতা, কর্মদক্ষতা, প্রযুক্তির নেশা এবং দেশপ্রেম এনার্জিপ্যাককে বিশ্বের বুকে একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছে।"

রবিউল আলম জানান, তাদের পণ্য আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষ পরীক্ষাগারে মান উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বের ১৫টি দেশে সুনাম কুড়িয়েছে, দেশীয় চাহিদারও সিংহভাগ জোগান দিচ্ছে। আর এই অর্জন সম্ভব হয়েছে কেবল দেশীয় প্রকৌশলীদের ওপর ভরসা করে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল নির্ভরতা ছিল কৃষির ওপর। সে সময় জিডিপির ৫৩ শতাংশেরই জোগান আসতো সেখান থেকে। এরপর অবস্থান ছিল শিল্পের, ১৭ শতাংশ। কিন্তু, ৫০ বছরে এই হিসাব এক রকম আমূল বদলে গেছে। কৃষির ভাগ কমে, শিল্পখাতের অংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩ শতাংশে। কেবল তা-ই নয়, প্রতিবছরই তাতে যুক্ত হচ্ছে নিত্যনতুন অনুষঙ্গ। সম্প্রতি অনুমোদিত অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তথ্য বলছে, ২০২৫ অর্থবছর শেষে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান বেড়ে হবে ৪২ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, "স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে শুরু করেন। আমরা শুরুতে অনুন্নয়নশীল দেশ ছিলাম। বঙ্গবন্ধু সেখান থেকে স্বল্পোন্নত দেশে পরিণত করলেন। এরপর শেখ হাসিনা, ২০১৮ সালে উন্নয়নশীলের কাতারে নিয়ে গেলেন।" তাঁর মতে, প্রতিটি দেশের এই পরিবর্তনের ধাপগুলোতে কিছু বিবর্তন হয়, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও হয়েছে।

প্রথাগত শিল্প থেকে এখন প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের দিকে এগেচ্ছে বাংলাদেশ। এ দেশের তৈরি মোটরসাইকেল বিদেশের মাটি ছুঁয়েছে বহু আগেই। মোবাইল ফোন, টিভি, ফ্রিজ কিংবা ঘরোয়া নিত্যব্যবহার্য শোভা পাচ্ছে ইউরোপ আমেরিকার বাসা বাড়িতে। ট্রান্সফরমার, সাবস্টেশন রপ্তানি হচ্ছে ভারতের বাজারে। চীন কিনছে স্টিল তৈরির কাঁচামাল, বিলেট। বিশ্বের সেরা দশ খেলনা প্রস্তুতকারকদের একটি মেইগো, এদেশে কারখানা বসিয়ে তৈরি করছে দামি দামি পণ্য। বিশ্বখ্যাত গাড়ি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান প্রোটনের কারখানা চালু হয়েছে আরো আগে।

*পিএইচপি গাড়ি সংযোজন কারখানা*

*উৎপাদন, সরবরাহ এবং রুটিন কাজকর্মে বাড়ছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার*

শিল্প খাতের এই বিবর্তনের পেছনে দেশীয় প্রকৌশলীদের ভূমিকাকে অনন্য উল্লেখ করে ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, "আগে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা দেশের ভেতরে সুযোগ না থাকায় বাইরে চলে যেতেন। এখন যাওয়ার প্রবণতা তো কমছেই, উল্টো বাইরে থেকে চলেও আসছেন। তবে, দেশের জন্য লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং সেগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করা একটা চ্যালেঞ্জের।" সেখানেও প্রকৌশলীরা সফল হবেন বলে আশা তার।

**সামনের চ্যালেঞ্জ**

তথ্যপ্রযুক্তিখাতের বহুমাত্রিক উন্নয়ন আমাদেরকে সমৃদ্ধ করছে প্রতিনিয়ত। যেখানে দেশীয় প্রকৌশলীদের নানামুখী আবিষ্কার এবং নিদের্শনা প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।

তবে, এই অর্জনে থেমে থাকার সুযোগ নেই। কারণ, সামনের দিনগুলোতে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বড় বড় চ্যালেঞ্জ আসছে বিশ্বব্যাপী। বিশেষ করে, প্রযুক্তির উচ্চতর ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনা, সরবরাহ ব্যবস্থাপনাকে আরো চৌকস করাসহ কর্মসংস্থানে দক্ষ জনবলের সম্পৃক্ততার বিষয়টি এখন জোর আলোচনায়।

প্রযুক্তির ক্রমপরিবর্তশীলতার এই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে বাংলাদেশের খাপ খাইয়ে নেয়ার সুযোগ কতোখানি? এই প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, "প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এদেশীয় প্রকৌশলীদের ভূমিকা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু, এখনো বিদেশি নির্ভরতা অনেক। আমরা মৌলিক আবিষ্কার বা স্থাপনায় ততোটা উন্নত হতে পারিনি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরামর্শকের সাহায্য নিতে হচ্ছে। কিন্তু, এটি কমানোর সুযোগ ছিল।"

দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনায় চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। এর উদ্দেশ্য হলো, উৎপাদন, সরবরাহ এবং রুটিন কাজকর্মে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার। যা এরই মধ্যে চালু করেছে বহু দেশ। যেমন, এবার করোনাকালে ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছে দেয়া হয়েছে ড্রোনের মাধ্যমে। তবে, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিদেশি বিনিয়োগ আরো বেশি আকর্ষণ করা জরুরি।

এখনো সেই সুযোগ আমাদের দেশে কাজে লাগানো যায়নি। তবে, এর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতে প্রস্তুত হচ্ছে বহু অর্থনৈতিক অঞ্চল। এরই মধ্যে কিছু বিদেশি প্রতিষ্ঠান কাজও শুরু করেছে সেগুলোতে। যেখানে, বিদেশিদের সঙ্গে অবদান রাখার সুযোগ বাড়ছে বাংলাদেশিদের।

ড. জাহিদ বলেন, "আমাদের সুবিধা হলো, তরুণরা প্রযুক্তিকে সহজে ধারণ করতে পারেন। প্রকৌশলীরাও অনেক বেশি দক্ষ এবং চৌকস। তাই সামনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাদেরকে আরো বেশি এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য আমাদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থারও উন্নয়ন করা জরুরি। জানান, এদেশে কাজ করার সুযোগ বিস্তৃত। কিন্তু যারা কাজ করবেন তাদেরকে সেই সুযোগ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে হবে।"

অধ্যাপক শামীম জেড বসুনিয়া। ৭৫ পার করেও মাঠ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন প্রকৌশল জ্ঞান এবং আধুনিক কাঠামোগত নকশার উন্নয়নে। ১৯৬৯ সালে, তরুণ বয়সে শুরু করেন শিক্ষকতা। স্বাধীনতার পর যোগ দেন দেশ পুনর্গঠনে। শাহজালাল বিমানবন্দর, ইনডোর স্টেডিয়াম, মিরপুর ক্রিকেট স্টেডিয়াম, বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামসহ অসংখ্য স্থাপনা নির্মাণ ও সংস্কার করেছেন নিজ হাতে। বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন পদ্মা সেতুর সরকারি পরামর্শক কমিটির প্রধান হিসেবে। সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের দায়িত্ব পড়েছে ঢাকায় ২৬৮ কিলোমিটার সাবওয়ে নির্মাণের। আলাপচারিতায়, বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের মেধা, দক্ষতা ও দায়িত্ববোধ তুলে ধরলেন গর্বের সঙ্গে। জুড়ে দিলেন কিছু অপ্রাপ্তির কথাবার্তাও...

সাক্ষাৎকার

# টেন্ডারেই শর্ত দিন, প্রকল্পে অন্তত একশ দেশি ইঞ্জিনিয়ার থাকতে হবে

অধ্যাপক শামীম জেড বসুনিয়া

**প্রশ্ন:** একটা উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যে আপনি তরুণ শিক্ষক হিসেবে বুয়েটে যোগ দিলেন। সে সময়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি কেমন ছিল?

**অধ্যাপক শামীম জেড বসুনিয়া:** ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে আমি গ্র্যাজুয়েট করি, তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে। আর আমি ইউনিভার্সিটি থেকে জয়েন করি ১৯৬৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বরে। অর্থাৎ তিন বছর দশ মাস পরে আমি জয়েন করি। এই সময়ে আমি একটা আমেরিকান ডিজাইন ফার্ম, লুই বার্জার ইঞ্জিনিয়ার্সে একজন ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করি। সেখানে থেকে আমি বেশ কিছু স্ট্রাকচারাল ডিজাইন করেছি। সে সময়ের ডিজাইনগুলোর মধ্যে এখনকার সিভিল ইঞ্জিরিয়ারিং বিল্ডিংটাই প্রথম। আসলে শিক্ষক হিসেবে আমার জয়েন করার কথা ছিল '৬৫- তেই। কিন্তু, কী কারণে যেন করলাম না, চলে গেলাম এবং সেখানে থেকেই আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ভবনের ডিজাইন করি। এটা আসলে বড় একটা সুযোগ ছিল। সেখান থেকে ডিজাইনের প্রতি একটা মোহ তৈরি হয়ে গেলো।

তারপর ১৯৬৯-এ জয়েন করার পর দেশের উত্তাল পরিস্থিতি। আমরাও তখন তরুণ। যাহোক, এরপর ৭১-এর যুদ্ধ। সে সময়টা আমাদের নানা দুশ্চিন্তার মধ্যেই কেটেছে। যুদ্ধের পর আমাদের অবস্থা আসলে ভালো ছিল না। তখন চারদিকেই যাচ্ছেতাই অবস্থা। বঙ্গবন্ধু তখন বললেন, তোমাদের বেতন কেটে রাখা হবে। পরে দিয়ে দিবো। দিয়েছেনও তাই। সে হিসেবে আমরা তখন সবাই তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তারপর যখন সংস্কার কাজ শুরু হয়, সেটা হয়ে গেলো আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

**প্রশ্ন:** কীভাবে সংস্কার শুরু হলো?

**অধ্যাপক শামীম জেড বসুনিয়া:** প্রথমেই শুরু হলো ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজগুলো মেরামত। একটা সুবিধা ছিল, প্রায় সবগুলো ব্রিজই তৈরি করেছিল লুই বার্জারস ডিজাইন ফার্ম; আমি যেখানে '৬৫-তে কাজ শুরু করি। অনেকগুলো ব্রিজের ডিজাইনও আমি করেছিলাম। তো যাহোক, তখন পরিকল্পনা কমিশনও সেই পরিকল্পনা করেছিল, সীমিত সম্পদ দিয়ে কীভাবে কাজ করা যায়। পরবর্তীকালে প্রফেসর ইউসুফজাই পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হলেন। তখন আমরা ইয়াং টিচার। আবার অনেকে তখন বিদেশে যেতে শুরু করলেন, জামিলুর রেজা চৌধুরীসহ কয়েকজন ছাড়া। ফলে একটা ঝামেলার মধ্যে পড়তে হলো। ঠিক সে সময়ই, ১৯৭২ সালে আমরা এখনকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ছাদের ডিজাইন

করতে শুরু করলাম। মানে, দেশের অবস্থা নাজুক ছিল। আমরা আস্তে আস্তে এগুলোর সংস্কারে জড়াচ্ছিলাম। এই ছিল শুরু। সময়গুলো খুব খারাপ ছিল।

মিরপুরে একটা লোহার ব্রিজ ছিল; এখনো আছে। আর সাভারের ব্যাংক টাউনের কাছে একটা ব্রিজ আছে, এখনো ভালো। সেগুলো কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তখন এগুলো ঠিক করার জন্য ভারতীয়রা আমাদের সাহায্য করেছে। অনেক জায়গায়ই কিন্তু ভাঙা ছিল। সব সংস্কার করেই আমাদের এগোতে হয়েছে। টঙ্গীর ব্রিজ তখন একটা ছিল, সেটারও ক্ষতি হয়েছিল। এ রকমভাবে আমরা বহু কাজ করেছি। গত দশ বছরে আসলে অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু, পরিকল্পনাগত কিছু ত্রুটির কারণে আমরা এখনো সমস্যায় আছি।

**প্রশ্ন:** প্রকৌশলে পাঁচ দশকের অগ্রগতিকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

**অধ্যাপক শামীম জেড বসুনিয়া:** এই পঞ্চাশ বছরে, আমি তো মনে করি একটা অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে। এই সময়ে যে সমস্ত কারিগর বা স্থপতি তৈরি হয়েছেন, তারা কিন্তু ঢাকার চেহারাকে বদলে দিয়েছেন। প্ল্যানাররাও অনেক পরিবর্তন করেছেন। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদেরও ব্যাপক ভূমিকা আছে। কারণ, তারা বাস্তবায়ন পর্যায়ে সবকিছুর জোগানদাতা। তবে, আমাদের এখানে ইঞ্জিনিয়ারদের সুযোগ কম। কারণ, লোন, গ্র্যান্ট সবই আসে বাইরে থেকে। তারা আবার একটা স্ট্রিং লাগিয়ে রাখে, কোথা থেকে কী নিতে হবে ইত্যাদি। আমি অন্তত এক ডজন বাংলাদেশি প্রকৌশলীর নাম বলতে পারি যারা আমেরিকা, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। আমাদের চেয়ে অনেক কঠিন, অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের কাজ করেন। আমরা পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল, ২৩৮ কিলোমিটারের সাবওয়ে ইত্যাদিতে ৬/৭ জন বিদেশি প্যানেল অব এক্সপার্ট রেখেছি; একজন নেদারল্যান্ডস এবং ছয়জন আমেরিকা থেকে এসেছে। এর সবাই কিন্তু বাংলাদেশি! তারা কিন্তু তূখোড় মেধাবী। কয়েকজন আমাদের ছাত্র, বুয়েটের শিক্ষক। সারা বিশ্বের বহু প্রকল্প তারা বাস্তবায়ন করছে। কারণ, তাদের সেই সুযোগ বা জোগান আছে। আমাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই। সুযোগ যদি থাকে, জোগান যদি থাকে, আমরাও সে রকম হতে পারি। যেমন, ১৯৮১-৮২ তে আমরা ইস্ট ওয়েস্ট ইন্টারকানেক্টর প্রজেক্ট করলাম। ব্যাপক একটা অর্জন সেটা। ফুল স্কেলে টেস্টিং হলো বিদেশে। ড. আলমগীর হাবিব গিয়েছিলেন। আমরাই কিন্তু এখানে সেটার ডিজাইন করি, সেটা আমাদের আরেকটা এক্সপোজার হলো। বুয়েটও আস্তে আস্তে বিভিন্ন প্রকল্পে নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে থাকলো। তার মানে, আমরা না পারার কোনো কারণ নাই। যেমন কর্ণফুলী চাইনিজরা করছে। কারণ, টাকাপয়সা তারা আনছে। অথচ, এর টেকনোলজি কিন্তু আমরা জানি; করতেও সক্ষম, জোগান নাই বলে পারছি না। তবে, সরকার চাইলে কিন্তু বিদেশিদের সঙ্গে দেশিয় প্রকৌশলী যুক্ত করে কিন্তু বাস্তবায়ন করাতে পারে।

কুর্মিটোলায় আন্ডারপাস ইন্ডিয়ানরা করছে। অথচ, আমরা কিন্তু অর্ধেক টাকায় করে দিতে পারতাম; আর্মি দেখভাল করতে পারতো।

**প্রশ্ন:** বহু বড় এবং নামকরা স্থাপনার সঙ্গে আপনি যুক্ত। এগুলো আমাদের প্রকৌশল এবং নকশার মানকে কীভাবে পরিবর্তন করেছে?

**একটা অথরিটি বানিয়ে এগুলো বাস্তবায়ন করা হলে তো আর এই ঝামেলা হতো না। আসলে প্রকৌশলীদের ট্রাস্ট করতে হবে। দুর্নীতির কথা যদি বলেন, আমি বলবো প্রকৌশলীদের সম্পৃক্ততা সেখানে অন্য সবার চেয়ে কম। একেবারে নাই, আমি সেটা বলবো না।**

**আমরা পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল, ২৩৮ কিলোমিটারের সাবওয়ে ইত্যাদিতে ৬/৭ জন বিদেশি প্যানেল অব এক্সপার্ট রেখেছি; একজন নেদারল্যান্ডস এবং ছয়জন আমেরিকা থেকে এসেছে। এর সবাই কিন্তু বাংলাদেশি! তারা কিন্তু তূখোড় মেধাবী।**

**অধ্যাপক শামীম জেড বসুনিয়া:** আমি বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের কথা বিশেষভাবে বলতে চাই। প্রায় ২১ বছর ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে জড়িত। যদিও কখনো ফুটবল খেলি নাই। তেমন, স্টেডিয়ামের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, ভেঙে যায় যায় অবস্থা! সরকার একটা কমিটি করলো, আমাকে চেয়ারম্যান করে। আমরা এমনভাবে ভেতরে কাজ করছিলাম, বাইরে থেকে কেউ টেরই পায়নি। গ্যালারি থেকে শুরু করে সব পরিবর্তন করেছি। এর ওপর বিদেশে পেপারও ছাপা হয়েছে। চার মাস করে একেকটা অঞ্চল বন্ধ রেখে কাজ করতে হয়েছে। খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জ ছিল সেখানে। আর এটা না করলে ২০১১ সালের ওয়ার্ল্ড কাপের ওপেনিং হতো না। এরপর মিরপুর স্টেডিয়ামের কথায় আসি। হঠাৎ একদিন ডাক দিলো মাহবুব আনাম। ডেকে নিয়ে বললো, স্যার, আমরা টেস্ট স্ট্যাটাস পেয়েছি। এটাকে ক্রিকেট স্টেডিয়াম করে দিতে হবে। লবি সাহেব তখন বিসিবি প্রেসিডেন্ট। আমি ক্রিকেট খেলতাম, স্টেডিয়ামে খেলা দেখেছি। কিন্তু, কী কী থাকে, সেটা তো জানতাম না। আমাদেরকে সব ডিমান্ড পেপারস দেয়া হলো, সঙ্গে নিলাম প্রফেসর শফিউল্লাহকে। আমরা একসঙ্গেই কাজ করতাম, ও আবার মাঠের কাজ খুব ভালো বোঝে। আমাদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার একজন কনসালট্যান্ট ছিল, মাঝে মধ্যে আসতো। আমরা এরপর টেন্ডার করালাম। আটজনের মধ্যে সাতজন কোয়ালিফাই করলো। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কনসালট্যান্ট বললো, আটজনকেই নাও। এরপর বিট করলো। মজার বিষয় হলো, সেই আট নম্বরই ছিল বেস্ট। পরে সিলেট স্টেডিয়ামের কাজও তারা করলো। প্রথমে মাঠ চষে ফেললাম। শফিউল্লাহ বললো, দেড় ফুট ফেলে দিতে হবে। করলাম। এই শেপটা করার কারণে, এখন আর পানি জমে না; সেটা শফিউল্লাহ নিজ হাতে করছে। কোনো কিছুই ভাঙা যাবে না, এই শর্ত ছিল। ফলে, মিডিয়া সেন্টারে আমরা চমৎকার একটা শেপ দিলাম। পরে আইসিসি এসে অনুমোদন দিয়ে দিলো। তবে, আমার লাইফে এখন পর্যন্ত করা সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল ইনডোর স্টেডিয়াম। এইটা অনেকে বোঝে না। এখানে প্রকৌশলগত অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল। জামিলুর রেজা চৌধুরী, আমি শফিউল্লাহ এবং ড. মোক্তাদির ছিলাম এটার বাস্তবায়নে। আমরা এটাও নমিনাল ফি-তে করেছিলাম। ফলে, আমরা অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িত আছি, অনেক পরিবর্তন এনেছি। কিন্তু, আমরা সে অনুপাতে মূল্যায়ন পাইনি। টাকাপয়সা তো আছেই। অনেকে মনে করে, ইঞ্জিনিয়ারদের আবার টাকা কিসের? বহু বড় প্রকল্পে বিদেশিরা টাকা নিয়ে যায়। অথচ আমরা পাই না। আমাদের মেধা নিয়ে প্রশ্ন নাই। আমরা সবই পারি। কিন্তু সাপোর্ট নাই। এই যে মাওয়া রোড দেখেন, বা আরো বহু সড়ক আছে। সেগুলো বাঙালিরা করছে না? তো আমাদের আরেকটা সমস্যা আছে, আমাদের কর্পোরেট কালচার এবং কন্টিনিউইটি নাই, সেটা খুব জরুরি। বড় বড় প্রকল্প, স্থাপনা আমাদের বহুগুণ দক্ষতা বাড়িয়েছে।

**প্রশ্ন:** দারিদ্র্য বিমোচনে ও তো প্রকৌশলীদের বড় ভূমিকা রয়েছে...?

**অধ্যাপক শামীম জেড বসুনিয়া:** অসামান্য ভূমিকা রেখেছে। আমার বাড়ি

রংপুরে। আগে আমার বাড়ি যেতে দুই দিন লাগতো। এখন মাত্র ৮ ঘণ্টায় যাই। এই যে, ওই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলো, এতে তো সবাই উপকৃত হলো। কৃষি থেকে শুরু করে সবাই এর সুবিধা পাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু সেতুর কথা ধরেন। একটা সময় বিশ্বব্যাংক বলেছিল, এটা ফিজিবল হবে না। কিন্তু এখন দেখেন, সেতুর আয় থেকে আমরা ঋণ শোধ দিচ্ছি, সংস্কারে ব্যয় করছি, আবার সরকারি কোষাগারেও টাকা দিচ্ছি। তো এর মানে হলো, ব্যাপক কর্মকান্ড বেড়েছে। আর এই সেতুর কারণে, ওভারঅল উত্তরবঙ্গের চেহারা বদলেছে। অবশ্যই সেটা দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রেখেছে। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি গ্রামের ঘরবাড়ি ছিল শণ, পাতা, বেড়া ইত্যাদির। এখন তো নাই। আমরা প্রতিবছরই কিছু কিছু সহায়তা দেয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু এখন আমি আর লোক খুঁজে পাই না। সুতরাং এগুলো তো আমাদের অবকাঠামো উন্নয়নের কারণে হয়েছে। ছোটবেলায় শুনতাম, অভাব আর অভাব। খাবার কম, পোশাক নাই। তখন তো লোকও অনেক কম ছিল। এখন ২০ কোটি লোক হয়েও আমরা ভালো আছি। এটা তো অনেক বড় অর্জন। আমাদের আঞ্চলিক সড়ক, মহাসড়কও এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে।

**এখানে সমস্যাটা কোথায় দেখেন, প্রকৌশলীদের কোনো প্রমোশন হয় না। অথচ সরকারের অন্য সব পর্যায়ে হচ্ছে। পুলিশে এতো বড় বড় প্রমোশন হলো। সারাদেশে চিফ ইঞ্জিনিয়ার মাত্র একজন। তো, পুলিশের চেয়ে কী তাহলে প্রকৌশলীরা খারাপ ছাত্র? একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ার এক্সটেনশন পেলে বিপরীতে পাঁচজন রিটায়ারমেন্টে চলে যায়। তো, এখানে তো উন্নয়ন দরকার।**

**প্রশ্ন:** এই অর্জনে প্রকৌশলীদের ভূমিকা কতটুকু?

**অধ্যাপক শামীম জেড বসুনিয়া:** প্রকৌশলীরা তো বড় ভূমিকা রেখেছে। এই যে, অবকাঠামোর উন্নয়ন কিংবা পরিবর্তন, এখানে তারা কাজ করেছে না? এখন না হয় বড় প্রকল্পে বিদেশিরা বেশি কাজ করছেন। কিন্তু, গ্রামীণ উন্নয়নে তো তারাই সামনের সারিতে ছিল। কিন্তু এখানে সমস্যাটা কোথায় দেখেন, প্রকৌশলীদের কোনো প্রমোশন হয় না। অথচ সরকারের অন্য সব পর্যায়ে হচ্ছে। পুলিশে এতো বড় বড় প্রমোশন হলো। সারাদেশে চিফ ইঞ্জিনিয়ার মাত্র একজন। তো, পুলিশের চেয়ে কী তাহলে প্রকৌশলীরা খারাপ ছাত্র? একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ার এক্সটেনশন পেলে বিপরীতে পাঁচজন রিটায়ারমেন্টে চলে যায়। এখানে তো উন্নয়ন দরকার। সরকারি পর্যায়ে আরো বেশি সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। পলিসিগত বিষয়েও তাদেরকে টানতে হবে। এখানে আইইবির ভূমিকা আরো কার্যকর করতে হবে। আমরা দেখি, বহু বড় প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, অথচ টিমে কোনো প্রকৌশলী নাই। এতে কী হয় দেখেন, পদ্মা সেতুর কথা বলি। প্রথমে ১০ হাজার কোটি টাকা খরচ ধরা হলো। এখন দেখেন খরচ কতো বেড়ে গেলো। আসলে, ওটা তো অসম্ভব একটা হিসাব ছিল। ইনিশিয়াল স্টেজটাই তো ঠিক ছিল না। তারপর, ফ্লাইওভারের কথা ধরেন। ২/৩টা প্রকল্প, একেকটা একেকজনকে বানাতে হলো কেন? একটা সংস্থা করলো না কেন? দেশ তো খুব ছোট। এটাই তো আমরা বুঝি না। ফলে আমাদের নকশায় ভুল হলো, খরচ নিয়ে ঝামেলা হলো। একটা অথরিটি বানিয়ে এগুলো বাস্তবায়ন করা হলে তো আর এই ঝামেলা হতো না। আসলে প্রকৌশলীদের ট্রাস্ট করতে হবে। দুর্নীতির কথা যদি বলেন, আমি বলবো প্রকৌশলীদের সম্পৃক্ততা সেখানে অন্য সবার চেয়ে কম। একেবারে নাই, আমি সেটা বলবো না।

**প্রশ্ন:** আমরা তো বিদেশিদের ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিলাম। এখনও কী সেটা আছে?

**অধ্যাপক শামীম জেড বসুনিয়া:** বললাম তো, কাগজ কলমে যে সাপোর্ট দেয়ার সেখানে আমাদের কোনো ঘাটতি নেই। আমরা যে পারি না তা না। বাট কনস্ট্রাকশন ইজ মেজর চ্যালেঞ্জ। যেমন পদ্মা সেতুর উদাহরণ দেই। তিনটা কোম্পানির কাছ থেকে আমরা টেন্ডার আহ্বান করি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এটার যে ফাউন্ডেশনের কাজ, অর্থাৎ, পাইলের প্রক্রিয়া ইত্যাদি করার জন্য তিনটি কোম্পানিরই সাব কন্ট্রাক্টর একজন ছিল। তার মানে, বোঝা গেলো, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এক্সপার্ট লোকজনের কতো ঘাটতি? তো, আমি তখন মজা করেই বলছিলাম, তোমরা তিন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তো একটা পাবেই। তাহলে, ওই সাবকন্ট্রাক্টর আগে ভাগেই কাজ শুরু করে দিক! সেটা জার্মানির একটা কোম্পানি ছিল। এইসব উন্নয়ন আমাদের হয়নি। আমরা এখনো ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ২০/২২ তলা বিল্ডিং করে ফেলি। আসলে এগুলোর চেঞ্জ না হলে হবে না। টেকনোলজিতে যে ইনভেস্টমেন্ট লাগে, সেটা কেউ করতে চায় না। কারণ, সেখান থেকে খরচ উঠিয়ে আনা কঠিন।

**প্রশ্ন:** শিক্ষক হিসেবে দেশের প্রকৌশলীদের কোন গুণটি আপনাকে মুগ্ধ করে?

**অধ্যাপক শামীম জেড বসুনিয়া:** এরা খুব পরিশ্রমী। এরা অল্পতে তুষ্ট। একটু প্রশংসা করেই তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু আদায় করে নিতে পারবেন। আসলে, এসব বৈশিষ্ট্য শুধু ইঞ্জিনিয়ার না, প্রত্যেক বাঙালিরই আছে। আমি তো এতো বছর পড়িয়েছি, তাদেরকে সহজে রিড করতে পারি। এবং এরা কখনোই কোনো কিছু জাহির করতে চায় না। এখনো তো মাঠে দৌড়াই। দেখি তো। কী কঠিন পরিশ্রম করেন সবাই, হাসিমুখে!

**প্রশ্ন:** সামনে তো বহু বড় প্রকল্প আসছে। সেগুলো বাস্তবায়নের সঙ্গে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ কতোখানি দেখেন?

**অধ্যাপক শামীম জেড বসুনিয়া:** দেখেন না, এই আর্মি। তারা আগে কী করতো, কিছু রুটিন ওয়ার্ক ছাড়া? তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কোর কী করতো? কিন্তু তাদেরকে যখন বের করা হলো, তারা কাজ করছে না? তাদের তো সেই জ্ঞান আছে, আমি নিজেই বহু ছাত্র পড়িয়েছি। কথা হলো, সুযোগটা তো দিতে হবে। এই যে, কেমিক্যাল গোডাউন সরানোর কাজও তারা এখন করবে। হাতিরঝিল বলেন, বিভিন্ন সড়ক, মহাড়কে তো তাদের সাকসেস আমরা দেখছি। ওরা থাকলে তো কাজও সময়মতো শেষ হচ্ছে। ক্যাপাবিলিটি কিন্তু এভাবেই গ্রো করে। আমাদের যে সমস্ত টেন্ডার হয়, সেখানে একটা ক্লজ থাকা উচিত যে, অন্তত একশ ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশি থাকতে হবে। এই যে, পদ্মা সেতুতে যদি আমরা চায়না মেজর ব্রিজকে বলে দিতাম, আমাদের ২০ জন ইঞ্জিনিয়ার থাকতে হবে, তাহলে তো আমাদেরই লাভ হতো। চীনে যেমন কোয়ালিটি কন্ট্রোলে ছিল, এখানেও থাকতে হতো। কিছু কিছু আছে, আরো বেশি থাকতে হবে।

**প্রশ্ন:** সম্পৃক্ততা বাড়ানো কতোটা জরুরি?

**অধ্যাপক শামীম জেড বসুনিয়া:** খুবই জরুরি। কারণ, আপনি সুযোগ না দিলে তো কেউ দেশে থাকবে না।

**প্রশ্ন:** দেশিয় প্রকৌশলীদের প্রকল্প বাস্তবায়নের মান কেমন?

**অধ্যাপক শামীম জেড বসুনিয়া:** মান খারাপ না। অবশ্যই ভালো। কিন্তু আমরা তো সময় ধরে রাখতে পারি না। এই পদ্মা সেতু আমরা ২০১৮ তে শেষ করতে চাইলাম, কীভাবে? এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ৯ বছর হয়ে গেছে, আরো কতোদিন লাগবে কে জানে? সুতরাং, কোয়ালিটির সঙ্গে সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

# দেশীয় প্রকৌশলীদের হাতেই আগামীর নির্মাণ

২০১৯ সালের অক্টোবরে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সাইটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি কলাম প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেন, কেন বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে, আর এই বিকাশের পেছনে কোন কোন বিষয় মূল শক্তি হিসেবে কাজ করবে। লেখার প্রথম অনুচ্ছেদে প্রধানমন্ত্রী তাঁর উন্নয়নের দর্শনটাকে তুলে ধরেছিলেন এভাবে: "আমার বাবা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন সোনার বাংলার, একটি শোষণমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজের। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে এগিয়ে নেওয়ার রূপকল্পকে বাস্তবায়নে, তাঁর দর্শন আমাদের আত্মবিশ্বাস জোগায়।" আত্মবিশ্বাস এখন যেন বাংলাদেশের প্রতিশব্দ হয়ে উঠেছে। পানিতে পদ্মা সেতুর কথাই ধরুন, ভূমিতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, বা মহাকাশ্যের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট। ৭৮৬ কোটি টাকার বাজেট দিয়ে যে দেশের যাত্রা শুরু, সেই দেশ এখন ১০টি মেগা প্রকল্পেই খরচ করছে পৌনে তিন লাখ কোটি টাকা।

আত্মবিশ্বাসই বাংলাদেশকে সাহসী করেছে। নিজের টাকায় পদ্মা সেতু, সেই সাহসকে সবখানে, সবার মনেই যেন ছড়িয়ে দিয়েছে। শুধু এক পদ্মা সেতুতেই কাজ করছেন ১৩০ জন দেশি প্রকৌশলী, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্পটি চালাচ্ছেন তেমনই ৩২ জন। সবাই এদেশেরই। প্রযুক্তিটা বিদেশের হলেও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প চালিয়ে নিতে গড়ে উঠছেন বাংলাদেশী তরুণেরাই। এই নিবন্ধের জন্য মেগা এই প্রকল্পগুলোর শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে একটা অভিন্ন বার্তাই পাওয়া গেছে: "সামনে আরো বড় প্রকল্প করতে পারবে আমাদের প্রকৌশলীরাই।"

সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার নেতৃত্ব দিচ্ছেন যারা, তারা

*পদ্মা সেতুতে কাজ করা দেশের প্রকৌশলীরা*

বলছেন আগামীর রূপকল্প দেশীয় মেধা ও জনবলকে মাথায় রেখে তৈরি, যেখানে তারা প্রকৌশলীদের আরো গভীর অংশগ্রহণ আশা করেন। বাইরে থেকে যারা উন্নয়নকে মূল্যায়ন করছেন, তাদেরও আশা, আজকের তরুণ প্রকৌশলীদের হাত ধরেই গড়ে উঠবে আগামীর আধুনিক বাংলাদেশ।

### পদ্মা সেতুর সাহস

ষড়ঋতুর এই বাংলাদেশের রূপ, চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্যে বদল আসে নিয়ম মেনেই। কিন্তু, খরস্রোতা পদ্মায় যেনো সেই নিয়ম-নীতির বালাই নেই। বর্ষার ভরা যৌবনে যখন দুকূল ছাপিয়ে উপচে পড়ে

জলরাশি, তখনও গভীরতার অভাবে নদীর বুকে কষ্ট হয় স্পিডবোট ছোটাতে। আবার, শরতের শেষভাগে পানি নেমে যাওয়ার কথা থাকলেও, এ বছর ভেঙেছে পাড়। বিলীন হয়েছে পদ্মা সেতু প্রকল্পের মালামাল।

এমনই অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষিত, প্রতিকূল সব পরিবেশে দিনরাতকে এক করে নির্মাণ করা হচ্ছে পদ্মা সেতু। হাজারের ওপরে দেশি-বিদেশি লোকবলের এই কর্মযজ্ঞের অন্যতম সৈনিক দেওয়ান আব্দুল কাদের। তিনি সেতু বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক। এই প্রকল্পে তিনি যুক্ত ১২ বছর। চীনসহ অন্যান্য দেশের বহু দক্ষ প্রকৌশলীর সঙ্গে এখানে কাজ করতে গিয়ে অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেক। নিজের জ্ঞান, পরিশ্রম এবং মেধার সবটুকুও ঢেলে দেয়ার চেষ্টা করেছেন দেশের সবচেয়ে গৌরবের এই প্রকল্পে। টেলিফোনে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন, পরিশ্রম পুরোপুরি সার্থক হবে তখনই, যখন বাংলাদেশের মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা পাবে। "আমার মতো ক্ষুদ্র এক প্রকৌশলীর এতো বড় প্রকল্পে কাজের সুযোগ পাওয়া সৌভাগ্যের। প্রথম দিকে অনেকে শ্রম দিতে হয়েছে। এজন্য ভীষণ কষ্ট করতে হয়েছে আমাদের। যেমন, প্রথম স্প্যান বসানোর পর দ্বিতীয়টির জন্য ২২৭ দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। পরিবার বা বেঁচে থাকার জন্যই কাজ করেছি, এটা একরকম ঠিক। কিন্তু, পরবর্তীকালে এটা হয়ে গেছে দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা," বলছিলেন আব্দুল কাদের।

পদ্মা সেতু প্রকল্পে ৪শ বাংলাদেশি কাজ করেছেন। এদের মধ্যে সরাসরি প্রকৌশলী ১৩০ জন। অভিজ্ঞতাটি সবার জন্যই নতুন ছিল। এটি একটি নতুন সুযোগও বটে। আর এই সুযোগ এদেশের প্রকৌশলীদের সাহস আরো বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে করেন মূল সেতুর এই প্রকল্প ব্যবস্থাপক। তিনি বলেন, "একটাই চিন্তা ছিল, সময়মতো কাজ শেষ করা। তার মধ্যেও বহু অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা এসেছে সামনে। সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছি সমাধানে। আসলে, দেশ স্বাধীন করা যেমন আনন্দের, আমার কাছে মনে হয়েছে পদ্মা প্রকল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য তেমনই," বলেন প্রকৌশলী কাদের। তাঁর বিশ্বাস, ভবিষ্যতে আরো বড় প্রকল্প বাংলাদেশের প্রকৌশলীরা নিজেরাই করতে পারবেন।

**পদ্মা সেতু প্রকল্পে ৪শ বাংলাদেশি কাজ করেছেন। এদের মধ্যে সরাসরি প্রকৌশলী ১৩০ জন। অভিজ্ঞতাটি সবার জন্যই নতুন ছিল। এটি একটি নতুন সুযোগও বটে।**

স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশ গঠনে একটা সময়ে পুরো নির্ভরতাই ছিল বিদেশিদের ওপর। সে সময়, বড় কিংবা মেগা প্রকল্পের চেয়ে বরং মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণই ছিল জরুরি। ভালো-মন্দের বিচার বিশ্লেষণও হয়ে পড়েছিল গৌণ। প্রযুক্তির ব্যবহার কিংবা বৈশ্বিক যোগাযোগের নতুনত্বও তখন সামনে আসেনি। কিন্তু পঞ্চাশের দুয়ারে পা রেখে বাংলাদেশ আজ ভাবতে শিখেছে নতুন করে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, অর্থনীতিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া কিংবা দেশকে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ নির্মাণের লক্ষ্যে চলা কার্যক্রমের বড় অংশেই সম্পৃক্ততা বেড়েছে নিজস্ব লোকবলের। কেবল তা-ই নয়, বিদেশি বহু প্রতিষ্ঠান, সংস্থায় বাংলাদেশি পেশাজীবীরা রেখে চলেছেন সাফল্যের স্বাক্ষর। এখানে বিশেষভাবে অবদান রয়েছে এদেশের প্রকৌশলীদের।

২০১১ সাল থেকে পদ্মা সেতুর প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শফিকুল ইসলাম। তার চোখে এটি বাস্তবায়নে দেশের প্রকৌশলীদের যে শ্রম, মেধা আর একাগ্রতা, তা অকল্পনীয়। "এটি বিশ্বের অন্যতম জটিল প্রকল্প। প্রতিটি পদক্ষেপেই ছিল অসংখ্য চ্যালেঞ্জ। সেটা কাটিয়ে আবার কাজ শুরু করতে এদেশীয় প্রকৌশলীরা সামনের সারিতে ছিলেন। এই অভিজ্ঞতা কিন্তু আমাদের সাহসকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে," বলেন তিনি।

*দেশি-বিদেশি প্রকৌশলীরা নির্মাণে ব্যস্ত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে*

**রূপপুরের শক্তি**

একই রকম সাহস আর আত্মবিশ্বাসের দেখা মিলবে পাবনার রূপপুরেও। সেখানে হাজারো দেশি-বিদেশি প্রকৌশলী, বিশেষজ্ঞ আর শ্রমিক মিলে আরেক মেগা প্রকল্প, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ব্যস্ত। প্রকল্প পরিচালক ড. শৌকত আকবর বলছিলেন এখানে কাজ করা বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের কথা। তার ভাষায়, "যে কোনো বিষয় বিশ্লেষণ কিংবা সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো অংশেই রাশিয়ানদের চেয়ে কম না স্থানীয়রা। ফলে, এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ভবিষ্যতে আরো কঠিন, জটিল ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষম।"

দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এই প্রকল্পে ব্যয় হচ্ছে ১ লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা। রাশিয়ার অর্থ ও প্রযুক্তি সহায়তা হলেও, এখানে বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের রয়েছে অসামান্য অবদান। এই বিষয়টিই ব্যাখ্যা করছিলেন ড. আকবর। তাঁর মতে, এটি কেবল একটি অবকাঠামো নয়, বরং অর্থনৈতিক সামর্থ, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নের বড় মানদন্ড।

তিনি বলেন, "পরমাণু এমন একটা বিষয়, যা বাস্তবায়ন করতে গেলে বহু আন্তর্জাতিক বিষয় পরিপালনের সক্ষমতা প্রমাণ করতে হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ কারিগরি ও প্রকৌশল দক্ষতার ক্ষেত্রে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছালো।"

**আরো বড় কিছু করার আশা**

এবার আসা যাক বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্পের কথায়। ২,৭৬৫ কোটি টাকা খরচ করে নির্মিত এই ভূ-উপগ্রহ, কক্ষপথে নিক্ষেপ করা হয় ২০১৮ সালে। এটি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য গাজীপুরের তেলীপাড়া ও রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়ায় দুটি গ্রাউন্ড স্টেশন নির্মাণ করা হয়। এর দেখাশোনার জন্য নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান থ্যালেস আলেনিয়ার সঙ্গে চুক্তি আছে, কিন্তু যুক্ত আছেন বহু দেশি প্রকৌশলীও। এই বিষয়ে কথা হয় বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহমুদের সঙ্গে। তিনি বলেন, "রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনায় আমাদের দেশীয় ছেলেরা অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। শুরুর দিকে আমরা কয়েকজনকে

*সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১*

ফ্রান্স পাঠিয়েছিলাম প্রশিক্ষণের জন্য। তারা সেখানেও মেধার স্বাক্ষর রেখে এসেছেন।" উৎক্ষেপণের পর বছর খানেক বিদেশি প্রকৌশলীরা প্রকল্পের কাজ দেখাশোনা করতেন। এখন পুরো দায়িত্ব ৩২ জন বাংলাদেশি প্রকৌশলীর কাঁধে। তিনি বলেন, "দেশের সব টিভি চ্যানেল এখন চলছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে। এতে আমাদের প্রচুর অর্থ দেশেই থেকে যাচ্ছে। অন্যদিকে, প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আমরা এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা দিতে পারছি। আর এসব সম্ভব হচ্ছে আমাদের ছেলেদের কারণে। আর তাদেরকে ঘিরেই আমরা এখন স্বপ্ন দেখছি ভবিষ্যতে আরো বড় কাজ করার।"

**নিজ শক্তিতেই সমৃদ্ধি**

স্বাধীনতার থেকে স্বনির্ভরতার পথ পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন এগোচ্ছে সমৃদ্ধির দিকে। গন্তব্যটা দূরের নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ উচ্চ আয়ের উন্নত দেশ হবে। এই লক্ষ্য নিয়েই তৈরি হয়েছে সরকারের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা।

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য ও সিনিয়র সচিব ড. শামসুল আলম সরকারের এই পরিকল্পনা প্রণয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি বলেন, "পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষভাবে দেশীয় পেশাজীবী বা প্রকৌশলীদের যে দরকার হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। একটা সময় আমাদের অতি নির্ভরতা ছিল বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর। সেটা আস্তে আস্তে কমে আসছে। ভবিষ্যতে আরো কমাতে হবে, সে পরিকল্পনা আমাদের আছে"।

বাংলাদেশী প্রকৌশলীরা বিশ্বের বহু দেশে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন। সরকার মনে করছে, এদেশে তারা আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন। ড. শামসুল আলম বলেন, "এখন আমরা বহু প্রকল্প বিদেশি প্রকৌশলীদের দিয়ে করাচ্ছি। কিন্তু, তাদের সঙ্গে অনেক দেশীয় জনবলও আছে। এতে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ছে। সেই অভিজ্ঞতাই ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে হবে। ভবিষ্যতে তাদের অংশগ্রহণ আরো বাড়বে বলে আমার বিশ্বাস। সঙ্গত কারণেই বাড়তে হবে।"

**স্মার্ট বাংলাদেশ**

ফিরে আসা যাক, প্রধানমন্ত্রীর সেই কলামের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে, যেখানে তিনি বলছেন, "গত বছর আমরা ১২টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট কোরিয়ায় রপ্তানি করেছি। বাংলাদেশে তৈরি চারটি জাহাজ ভারতে গিয়েছে। সম্প্রতি ভারতের রিলায়েন্স বাংলাদেশে তৈরি ফ্রিজ কিনেছে বড় পরিমাণে। বাংলাদেশের ৬ লাখ আইটি ফ্রিল্যান্সারও আছে, যা কিনা সবচেয়ে বড় ফ্রিল্যান্সিং কমিউনিটি। এই সব কিছু নীরব এক রূপান্তরের কথা বলে, যেখানে মানুষ ঝুঁকি নিয়েছে এবং চ্যালেঞ্জ সামলেছে, প্রযুক্তিকে ধারণ এবং আরো উদ্ভাবনী হওয়ার মধ্য দিয়ে।" প্রযুক্তিতে এই সক্ষমতা বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ হওয়ার পথে আরো আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। মার্কিন ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং প্রতিষ্ঠান এটি কার্নির গোবাল লোকেশন সার্ভিস সূচকে তথ্যপ্রযুক্তি আউটসোর্সিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ২১। এই খাত থেকে গেল বছরই প্রায় ১০০ কোটি ডলার আয়ের হিসাব দিয়েছে সফটওয়্যার নির্মাতাদের সংগঠন বেসিসের হিসাবে। প্রকৌশলীনির্ভর এই খাত থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ৫০০ কোটি ডলার আয় হবে বলে আশা

**স্বাধীনতার থেকে স্বনির্ভরতার পথ পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন এগোচ্ছে সমৃদ্ধির দিকে। গন্তব্যটা দূরের নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ উচ্চ আয়ের উন্নত দেশ হবে। এই লক্ষ্য নিয়েই তৈরি হয়েছে সরকারের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা**

করা হচ্ছে। গেলো এক যুগে আইসিটি খাতের উন্নয়নকে অভাবনীয় সাফল্য মনে করেন কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম। তিনি বলেন, "এই সময়ে আমেরিকা, কানাডার মতো দেশ যে গতিতে এই খাতে এগিয়েছে, বাংলাদেশের এগুনোর হার তাদের চেয়ে বেশি।" এর পেছনে দেশীয় প্রকৌশলী ও পেশাজীবীদের অবদানকেই বড় নিয়ামক হিসেবে দেখছেন তিনি।

বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রগতি ও পরিকল্পনায় দেশীয় প্রকৌশলীদের অবদান বিষয়ে অর্থনীতিবিদ ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, "আমাদের একটা পুরোনো ধারণা ছিল যে, দেশীয় প্রকৌশলীরা মানসম্পন্ন কাজ করতে পারেন না। এটা কিন্তু এখন ভুল প্রমাণিত হয়েছে। দেশীয় অবকাঠামো নির্মাণে তাদের ত্যাগ এবং আন্তরিকতা আমরা দেখেছি। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙা করতে রাতদিন খেটে কাজ করেছেন। এখন বড় প্রকল্প বাস্তবায়নেও তারা আরো বেশি মনোযোগী। কাজেই সবটা মিলিয়ে বলতে গেলে, ভবিষ্যতে তাদের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিব বর্ষে [২০২০-২১] দেশবাসীকে শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় আনার ঘোষণা দিয়েছিলেন। মহাপরিকল্পনার পাশাপাশি নেয়া হয়েছিল ক্রাশ প্রোগ্রামও। কিন্তু এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা খুব সহজ ছিল না। শত শত, হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ারের পরিশ্রম, মেধায় কীভাবে সম্ভব হলো তা, সেই গল্পই শুনিয়েছেন প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ। তিনি ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (বুয়েট)-এর তড়িৎ কৌশল বিভাগ থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেন। একই বছর খালেদ মাহমুদ সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগ দেন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে। দীর্ঘ তিন যুগের বেশি সময় ধরে নানা পদে থেকে তিনি দেখেছেন, কীভাবে দেশ বিদ্যুৎ ঘাটতি থেকে উদ্বৃত্তের পথে গেছে...

সাক্ষাৎকার

# শতভাগ বিদ্যুতায়নে প্রকৌশলীরাই অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন

**প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ**

**প্রশ্ন:** আপনি বুয়েটে পাস করার পর পরই বিদ্যুৎ বিভাগে জয়েন করলেন, এটি কী শুধু একটি চাকরি করার জন্য নাকি আপনার মধ্যে কোনো কমিটমেন্ট কাজ করেছিল তখন?

**প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ:** তরুণ বয়সে মানুষ যখন পেশাগত জীবনে প্রবেশ করেন, তখন তার অনেক স্বপ্ন থাকে, কমিটমেন্ট থাকে। আমিও পেশার প্রতি এবং দেশের প্রতি একটি কমিটমেন্ট নিয়েই কর্মজীবন শুরু করেছিলাম। হ্যাঁ, এটা সত্যি, তখন আরো আকর্ষণীয় চাকরি সুযোগ ছিল সামনে। মধ্যপ্রাচ্যে, দুবাইয়ে আমাদের অনেক কাজের সুযোগ ছিল সে সময়। আমি কোথাও একটি ইন্টারভিউ দিতে যাইনি। সেখানে গেলে হয়তো আরো অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারতাম। অবসরের পরে, এখন অস্ট্রেলিয়া কিংবা কানাডাতে বসবাস করতে পারতাম। সেটা আমি চাইনি। আমরা চেয়েছিলাম, দেখি না আমরা এখানে কিছু করতে পারি কি না। কারণ, তখন এই সেক্টর বেশ দুর্বল ছিল। এতটাই দুর্বল ছিল, সাধারণ মানুষ পিডিবি সম্পর্কে কিছুই জানতো না। গ্রামে গেলে কোথায় চাকরি করি জানতে চাইলে পিডিবি উত্তর দিলে কেউ চিনতো না। তখন বাধ্য হয়ে, অনেক দিন বলেছি ওয়াপদাতে চাকরি করি। তখন দেখেছি মানুষ সম্মান করেছে। আর এখন গ্রামে গেলে মানুষ নিজে এসে বলে, আপনাদের পিডিবি তো দেখাইয়া দিলেন। বিদ্যুতের বিশাল উন্নতি হয়েছে। এখন তো আর লোডশেডিং হয় না। এই যে স্বীকৃতি, আমি মনে করি এটাই আমাদের অর্জন। এটাই পিডিবির সফলতা।

**প্রশ্ন:** আপনি যে বছর জয়েন করলেন, তার পরের বছরই তো সর্বপ্রথম দেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে থাকা বিদ্যুতিক লাইনকে যমুনা নদীর ওপর সংযুক্ত করা হয়?

**প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ:** ইস্টওয়েস্ট ইন্টারকানেক্টর যখন স্থাপিত হয় তখন দেশের দুই অংশের মধ্যে বিদ্যুৎ-সংযোগের একটি মেলবন্ধন তৈরী হয়। এ সময় পূর্বাঞ্চলের উৎপাদিত বিদ্যুৎ পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। এটার মূল পরিকল্পনা করেছিলেন শামসুল ইসলাম মিয়া। উনি যখন প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন, তখন এই কাজগুলো শুরু হয়েছে। ওখানে কোরিয়ান একটি কোম্পানি কাজ করেছিল। সেটা একটা দারুন কাজ ছিল। তখন তো নদীর ওপারে লোডশেডিংয়ের মাত্রা অনেক বেশি ছিল। এটা হওয়ার পরে নদীর ওপারের মানুষ কিছু কিছু বিদ্যুৎ পেত। এটা একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ ছিল।

**প্রশ্ন:** মূলত ঢাকার বাইরে বিদ্যুৎ যাওয়া শুরু করে ১৯৯০ এর পর, ৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ ব্যবহার হতো ঢাকাও আশপাশে। এই যে রাজধানীর বাহিরে

**বঙ্গবন্ধু একটা কথা বললেন, যে দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে থাকে, গ্রামে বিদ্যুৎ নিতে হবে। তখনই কিন্তু তার মাথায় এই চিন্তাটা হলো যে, আমাদের গ্রামের বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড করতে হবে। এটা কিন্তু তারই উদ্যোগ।**

বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়া এটা কতটা কঠিন ছিল?

**প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ:** স্বাধীনতার পর আমাদের তো ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ছিল। শুধু ১৫ ভাগ এলাকাতে সেই বিদ্যুৎ যেতো। বঙ্গবন্ধু একটা কথা বললেন, যে দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে থাকে, গ্রামে বিদ্যুৎ নিতে হবে। তখনই কিন্তু তার মাথায় এই চিন্তাটা হলো যে, আমাদের গ্রামের বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড করতে হবে। এটা কিন্তু তারই উদ্যোগ। তখন উনি মন্ত্রীদের পিডিবির চেয়ারম্যান বানালেন। স্বাধীনতার পর তিনজন মন্ত্রী পিডিবির চেয়ারমান হয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায় তখন বঙ্গবন্ধু সরকার বিদ্যুৎকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন। তখন গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল, নদীগুলো কীভাবে পার হবে। এই প্রযুক্তি আমাদের জানা ছিল না। এটা আমাদের খুব কষ্ট দিয়েছে। আর তখন সরকারের বাজেটও খুব কম ছিল। তখনও কিন্তু এই কাজগুলো হয়েছে, তবে খুব ধীরে ধীরে হয়েছে। ভেড়ামাড়ায় আমাদের তিনটা ২০ মেগাওয়াট করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছিল। খুলনাতে ১১০ মেগাওয়াট, ৬০ মেগাওয়াটের কেন্দ্র ছিল। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র ছিল। সবই অঞ্চল কেন্দ্রিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। তাই ঢাকার বাইরে বিদ্যুৎ সর্বোচ্চ ২০ থেকে ২৫ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ পেত। এটা বাড়তে বাড়তে ২০০৭-০৮ এ গিয়ে সেটা ৩৫ ভাগ হলো। দেশের সুষম উন্নয়নের স্বার্থে শুধু ঢাকার বাইরের শহরেই নয়, গ্রামাঞ্চলেও বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে। এই লক্ষ্য নিয়েই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ অপরিহার্য। সারাদেশকে আলোকিত করতে হলে সারাদেশেই বিদ্যুৎের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করতে হবে। কাজটি কঠিন হলেও এর কোনো বিকল্প নেই। এখন দেশের ৯৯% জনগোষ্ঠীই বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসে গেছে।

**প্রশ্ন:** বিদ্যুৎ উৎপাদন, তারপর বিতরণ, মাঝে সঞ্চালন লাইন তৈরি করা, এই প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল কাঠামোটি কখন হয়েছিল? এতে ইঞ্জিনিয়ারদের কী ভূমিকা ছিল?

**প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ:** এদেশে বিদ্যুৎ এর ইতিহাস শত বছরের পুরনো। সোয়া'শ বছর আগে ভাওয়াল পরগনার রাজা ছিলেন এ দেশের প্রথম বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী। পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে বেসরকারি ও সরকারি উদ্যোগে এটি সম্প্রসারিত হয়েছে।

১৯০১ সালে ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহর বাসভবনে একটি জেনারেটর স্থাপন করা হয়। ১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর আহসান মঞ্জিলে প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহের সূচনা হয়। ১৯১৯ সালে 'ডেভকো' নামক ব্রিটিশ কোম্পানির মাধ্যমে ঢাকায় সীমিত আকারে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার প্রথম বাণিজ্যিক বিকাশ শুরু হয়। ১৯৩৩ সালে ওই কোম্পানি ঢাকার পরীবাগে প্রায় ৬ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 'ধানমন্ডি পাওয়ার হাউস' নির্মাণ করে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিতরণ ব্যবস্থা মাত্র কয়েকটি কোম্পানির হাতে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন মাত্র ১৭টি প্রাদেশিক জেলা শহরে খুব সামান্য পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। ১৯৪৮ সালে গঠিত হয় ইলেক্ট্রিসিটি ডাইরেক্টরেট। ১৯৫৭ সালে সরকার দেশের সকল বেসরকারি পাওয়ার হাউস ও বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন অধিগ্রহণ করে। ১৯৫৯ সালে ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ওয়াপদা) গঠনের পর বিদ্যুৎ খাতে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। ১৯৬০ সালে ইলেক্ট্রিসিটি ডাইরেক্টরেট ওয়াপদার সঙ্গে একীভূত হয়। কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে কাপ্তাই-এ প্রথমে প্রতিটি ৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতার দুইটি ইউনিট থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয় ১৯৬২ সালে। তৎকালীন সময়ে কাপ্তাই ছিল বৃহত্তম বিদ্যুৎকেন্দ্র। ১৯৬২ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ এবং কাপ্তাই -সিদ্ধিরগঞ্জ (চট্টগ্রাম-ঢাকা) ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের কমিশনিং ছিল, দেশে বিদ্যুৎ উন্নয়নের একটি মাইলফলক।

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ সালের ৩১ মে রাষ্ট্রপতির আদেশবলে (পিও ৫৯) সাবেক ওয়াপদা থেকে পৃথক হয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশকে আলোকিত ও শিল্পায়িত করার দায়িত্ব নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের সমন্বিত সংস্থা হিসেবে মাত্র ৫০০ মেগাওয়াট স্থাপিত ক্ষমতাসহ যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)। পরবর্তী বিউবো'র বিদ্যুৎ সঞ্চালন, উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার পূর্ণ বা অংশবিশেষ অন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তরিত হয়। তবে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় এলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়। পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে নানা পরিকল্পনা গৃহীত হতে থাকে। বিদ্যুৎ একটি উচ্চ কারিগরি প্রক্রিয়া হওয়ায় প্রকৌশলীদের জ্ঞান, মেধা ও সম্পৃক্ততা ছাড়া এর উন্নয়ন সম্ভব নয়। সুতরাং বিদ্যুৎ যেমন উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি, তেমনিভাবে প্রকৌশলীরা হচ্ছেন বিদ্যুতের মূল চালিকাশক্তি। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে কেন্দ্র স্থাপনে আমাদের বিদেশি কোম্পানি বিশেষ করে জেনারেল ইলেক্ট্রনিক্স, সিমেন্সের ওপরই বেশি নির্ভর করতে হয়। দরপত্রে তারা অংশ নেয় এবং কাজ পায়। এমনকি পরামর্শকও বিদেশি নিতে হতো। একটা সঞ্চালন লাইন করবো, সেটার জন্যেও আমাদের বিদেশি পরামর্শকদের উপর নির্ভর করতে হতো। এর একটা বড় কারণ, সরকারি অর্থায়নের চেয়ে বিদেশি অর্থায়নেই বেশি প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়। যারা অর্থায়ন করে তাদের এমন শর্ত থাকে। তো তখন যেটা হয়েছে, বিদেশিরা এসেছে আর তাদের সঙ্গে থেকে থেকে আমাদের লোকেরা কাজগুলো শিখেছে। আগে কাজের সুযোগ কম ছিল, কারণ তখন খুব একটা বেশি পাওয়ার প্ল্যান্ট বছরে হতো না। আমাদের প্রকৌশলীরা কাজও শিখতে পারতো না।

এখন সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন প্রচুর কাজ হচ্ছে, আমাদের প্রকৌশলীরাও শিখছে আগের থেকে বেশি। প্রাথমিকভাবে যে কাজগুলো হয়েছে, তার বেশির ভাগই বিদেশি পরামর্শকের উপস্থিতিতে হয়েছে। ২০০৯ সালের পরে যে প্রকল্পগুলো করেছি, সেখানে কোনো পরামর্শক ছিল না। আমাদের লোকজন ডকুমেন্ট তৈরি করেছে। আমরা ডিজাইন ডেভেলপ করেছি। আমরা সুপারভিশন করেছি। সবই আমরা নিজেদের হাতে করতাম। এখন এই কাজগুলাকে আরো এগিয়ে বড় কাজ করার সময় এসেছে।

**প্রশ্ন:** মাত্র এক যুগ আগেও বিপুল ঘাটতি ও অব্যবস্থাপনায় ডুবে ছিল বিদ্যুৎ খাত। বর্তমানে উদ্বৃত্ত, এই অর্জনের পেছনে কী কী কৌশল ও সিদ্ধান্ত কাজ করেছে?

**প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ:** বিদ্যুতে আজকে যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, তার পেছনে রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ। তাঁর সরকারের গণমুখী সিদ্ধান্তের কারণে বিদ্যুৎ আজকের পর্যায়ে আসতে পেরেছে। তবে এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ এবং এদেশের প্রকৌশলীদের নিরন্তর পরিশ্রম ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।

আমি যখন বিদ্যুৎ বিভাগে যোগ দিয়েছি, তখন আমাদের উৎপাদন ছিল

৬৫০ মেগাওয়াট। সেইখান থেকে উত্তরণ হতে হতে আজকে ২৩ হাজার মেগাওয়াটে পৌঁছে। মাঝখানে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত দুই হাজার মেগাওয়াটের মতো যোগ হয়েছিল। পরে আবার তা কমে যায়। বড় পরিবর্তনটা হয়েছে কিন্তু ২০০৯ থেকে, যা অকল্পনীয়। আমার চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা যদি বলি, প্রতি ৫ বছর মেয়াদি সরকার, একটি করে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করেছে, সরকারি টাকায়। কোনো কোনো সময় সেটাও হয় নাই। কিন্তু ২০০৯ এ এই সরকার আসার পর, ৮৫০ মেগাওয়াটের ৯টা কেন্দ্রসহ মোট ১১টা বিদ্যুৎকেন্দ্র সরকারি অর্থায়নে চালু হয়েছে। এটা সরকারের বড় একটি পদক্ষেপ। এখানে যারা পিডিবির কর্মকর্তা আছেন, তাদেরও কিন্তু কন্ট্রিবিউশন আছে। সরকার মূলত এই প্রকল্পগুলোর টাকা ছাড় করে, চারটি প্রান্তিকে ভাগ করে। অর্থাৎ তিন মাস পর পর টাকা আসে। দেখা যায়, অনেক সময় প্রথম কিস্তির টাকা দেরি হয়। সেই সময় অর্থের জোগান ঠিক রাখতে, আমরা কিন্তু আমাদের পেনশন ফান্ডের অর্থও ব্যয় করেছি অনেক ক্ষেত্রে। পরে সরকার টাকা দিলে, সেটা আবার সমন্বয় করা হয়েছে। এই ধরনের সাহসী পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। সাহসী পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে, পিডিবি নিয়েছে। ফলে এই সফলতা এসেছে। এখন যেটা করতে হবে, আমাদের মানসম্মত বিদ্যুৎ দিতে হবে। এখনও অনেক জায়গায় লো ভোল্টেজ, সেটার উন্নতি ঘটাতে হবে।

**বিদ্যুতে আজকে যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, তার পেছনে রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ। তবে এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ এবং এদেশের প্রকৌশলীদের নিরন্তর পরিশ্রম ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।**

**প্রশ্ন:** বিদ্যুৎ খাতের মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে দেশিয় প্রকৌশলীরা কী ধরনের ভূমিকা রাখছেন?

**প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ:** আমরা এরই মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছে গেছি। ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশ হবো। সেই সময়ের অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে আমাদের বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র করতে হবে। এ জন্য মেগা প্রকল্পের কোনো বিকল্প নেই। ২০৩০ এ আমাদের ৪০ হাজার মেগাওয়াট দরকার হবে। এটা তো মেগা প্রকল্প ছাড়া সুযোগ নেই।

প্রযুক্তি কিন্তু দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছে। মেগা প্রকল্পগুলো আমরা সবচেয়ে উন্নত আর আধুনিক প্রযুক্তিতে করছি। সে কারণে এসব প্রকল্প বিদেশিদের সহায়তা ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে আমরা বিদেশি বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভরশীল, সাধারণত বিদেশি ইপিসি ঠিকাদাররাই এগুলো বাস্তবায়ন করে। তবে দুই-তিনটি এমন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা গেলে, এরপর থেকে আমরা নিজেরাই এমন কাজ করতে পারবো।

এখন আমাদের প্রকৌশলীদের এসব প্রযুক্তির ব্যবহার শেখার সময়। যাতে পরবর্তীকালে আমরা এগুলো নিজেরা তৈরি করতে পারি। মেগাপ্রকল্পসমূহ পরিচালনার জন্য দেশিয় প্রকৌশলীদের আরো বেশি সম্পৃক্ত করা গেলে দক্ষ কারিগরি মানবসম্পদ তৈরি করা সম্ভব হবে। মৌলিকভাবে আমাদের প্রকৌশলীরা অনেক মেধাবী। তবে তাদের অধিকতর পরিচর্যা প্রয়োজন। তবে কোনো প্রযুক্তি যখন নতুন আসবে, তখন ওই প্রযুক্তি যে দেশ থেকে এসেছে তাদের সহায়তা লাগবেই। যেকোনো মেশিনে দুই বছর ওয়ারেন্টি থাকে। আমরা এই দুই বছরে সেটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ শিখে নিচ্ছি। আমি যেটা বলে দিয়েছিলাম, প্রথম বছর আমাদের প্রকৌশলীরা দ্বিতীয় সারিতে থাকবে। বিদেশিরা সামনে থাকবে, তারা মেশিন চালাবে। দ্বিতীয় বছর আমাদের লোকেরা সামনে থাকবে, আর বিদেশিরা পেছন থেকে দেখবে সব ঠিকমতো করতে পারছে কিনা। এভাবে আমাদের প্রযুক্তি ট্রান্সফার করতে হবে।

**প্রশ্ন:** করোনার সময় নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ধরে রাখছেন কীভাবে?

**প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ:** জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা, দেশপ্রেম এবং সেবার মনোভাব থাকায় করোনাকালে কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও প্রকৌশলীসহ বিদ্যুৎ কর্মীরা মাঠে থেকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রেখেছিল এবং তা এখনো অব্যাহত আছে। আমরা বেশির ভাগ মানুষই কিন্তু এই সংকটের কালে ঘরে থেকেছি। কিন্তু প্রকৌশলীদের শুধু ঘর থেকে বের হলেই হয়নি, অন্য মানুষের বাড়িতে গিয়ে সমস্যার সমাধান দিতে হয়েছে। অনেকে আক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু মনোবল হারাননি। তাদের এই ত্যাগকে সবার অভিবাদন জানানো উচিত।

**প্রশ্ন:** ২০৩০ সালে ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে মহাপরিকল্পনা, সেটি কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে?

**প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ:** ২০৩০ সাল নাগাদ ৪০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতায় পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে এখন কাজ করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রকৌশলীদের দক্ষতাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে দেশে একটি শক্তিশালী কারিগরী দল সৃষ্টি হয়েছে। এটি ক্রম সম্প্রসারণমান। নতুন নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে দেশিয় প্রকৌশলীরা পরিচিত হয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করে চলেছেন। আগামীর যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাঁরা সক্ষম।

**প্রশ্ন:** বর্তমানে প্রায় শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায়। এটি বাস্তবায়ন কতোটা চ্যালেঞ্জের ছিল। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশিয় জনবলের ভূমিকা কী?

**প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ:** এ মুহূর্তে দেশের ৯৯ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। এই কাজটি গত কয়েক বছরে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। সরকার সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে এই শতভাগ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচি প্রণয়নও বাস্তবায়নে প্রকৌশলীরাই অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। হয়তো একটু দেরি হয়েছে। দেরি হওয়ার কারণ, আমাদের লোকবল একটু কম আছে। যত টুকু লোকবল আছে, তাই দিয়েই কাজ করাতে হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, কোনোভাবেই যেন কোনো প্রকল্পের মেয়াদ না বাড়ে, খরচ না বাড়ে। সেই সমস্যা সমাধানে আমরা আইইবি থেকে সব মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বসবো, আমরা বলবো, আমাদের যে লোকবল থাকার কথা, আমাদের লোকবল দেন। আমরা আমাদের সেক্টরগুলোকে সেইভাবে দক্ষ আর শক্তিশালী করতে পারবো।

**প্রশ্ন:** সামনের দিনগুলোতে দেশিয় প্রকৌশলীদের নিয়ে বিদ্যুৎ খাত কী আশা করে?

**প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ:** ইতোমধ্যে ডাইভারসিফাইড ফুয়েলভিত্তিক বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র বাংলাদেশে স্থাপিত হয়েছে। স্মার্টগ্রিড এবং স্মার্ট ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমও সংযুক্ত হতে যাচ্ছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে একটি দক্ষ জনবল ইতোমধ্যে তৈরী হয়েছে। তাদের লব্ধজ্ঞানের প্রকৃত ব্যবহার এবং তা ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে এই টিমকে আরো শক্তিশালী করা গেলে একসময় দেশিয় প্রকৌশলীরাই বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবেন। একসময় এ দেশে বিদ্যুতের জন্য মিছিল-মিটিং হয়েছে, ভাঙচুর হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকারের সদিচ্ছা, সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং শতভাগ বিদ্যুতায়নে প্রকৌশলীরাই অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। এক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের ভূমিকা বিশাল। আগামীর উন্নত দেশ বিনির্মাণে এদেশের প্রকৌশলী সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে আর উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে বিদ্যুৎ খাতের প্রকৌশলীরা এক্ষেত্রে সামনের সারিতে থাকবেন, এটাই প্রত্যাশিত।

পরিবেশ, নদী, জলবায়ু ও পানি ব্যবস্থাপনায় তার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। তিনি পড়েছেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, কিন্তু পড়ানোর দায়িত্ব ছিল ভিন্ন, অজানা এক বিষয়। নিজ মেধা, শ্রম আর অধ্যাবসায়ে আয়ত্ত করে, সেটাকেই নিয়ে যান অনন্য উচ্চতায়। নিজেও হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের সেরা পরিবেশবিজ্ঞানী। আলাপচারিতায় বললেন, এখনো দেশের প্রকৌশলীদের ঘাটতি রয়ে গেছে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা এবং সততায়। তবে সম্ভাবনা দেখছেন তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। ৭২ বছর বয়সে নিজেকেও রাখতে চান সেই কাতারে...

সাক্ষাৎকার

# তরুণ প্রকৌশলীরা দারুণভাবে এগোচ্ছে

আইনুন নিশাত

**প্রশ্ন:** ১৯৭২-এ তরুণ বয়সে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলো। তখনকার বাস্তবতা কেমন ছিল?

**আইনুন নিশাত:** আমি ১৯৬৯ সালে গ্র্যাজুয়েট শেষ করি। তিন বছর বাইরে চাকরি করেছি। এক বছর প্রাইভেট ফার্মে এবং দুই বছর ওয়াটার বোর্ডে। বুয়েট মূলত আন্ডারগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে বিদেশ থেকে যারা পিএইচডি করে আসছেন, অল্প কিছু ছিলেন, তারা পড়ানোর চাপে গবেষণার দিকে খুব একটা নজর দিতে পারতেন না। তার মধ্যেও কিছু ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষক ছিলেন, যারা বাইরের জগতের খোঁজখবর রাখতেন। যেমন, ড. ইকবাল মাহমুদ, ড. নূরুল ইসলাম আর জামিলুর রেজা চৌধুরী তখন কেবল বাইরে পা রাখা শুরু করেছেন। ড. ইউসুফজাই প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য হন। এছাড়া ড. হাসনাত বাইরে প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করে বুয়েটে শিক্ষকতায় যোগ দিলেন। এর বাইরে যারা ছিলেন, তারা অত্যন্ত মেধাবী, কিন্তু বুয়েটের চত্তরটাকেই মনে করতেন তাদের জগৎ। এই সীমাবদ্ধতা ছিল তখন। আর ভাইস চ্যান্সেলররা ভালো প্রশাসক ছিলেন। কিন্তু একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ দরকার ছিল, তখন সেটার ঘাটতি ছিল।

**প্রশ্ন:** তখন দেশের পরিস্থিতিও নাজুক ছিল?

**আইনুন নিশাত:** দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রথম কয়েক বছর বিদেশিরা ডমিনেট করতো। কারণ, আমাদের অর্থনীতি তো তখন ভালো ছিল না। আজ যেমন শেখ হাসিনা ধমক দিয়ে বলতে পারেন যে, আমি তোমার পয়সা নেবো না; তখন তো সে অবস্থা তো ছিল না। সুতরাং বিদেশিরাই ডমিনেট করতো, তারাই কাজ করতো। বলা যেতে পারে, তাদের করুণার ওপরই আমাদের চলতে হয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারও তখন ছিল না। যেমন পানি উন্নয়ন বোর্ডে পর্যাপ্ত প্রকৌশলী না থাকার কারণে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটদেরকে রিক্রুট করে ১/২ বছর ট্রেনিং করিয়ে, অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসার নাম দিয়ে কাজে লাগানো হয়। ডিপ্লোমা হোল্ডারদের সংখ্যাও খুব একটা হয়নি। তখন একটা মজার বিষয় ছিল, ইঞ্জিনিয়াররা দাপটে চলতো এবং ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে অনেক ক্ষমতা ছিল।

**প্রশ্ন:** স্বাধীনতার পরের সময়টাতে পানি ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত কাজকর্ম কেমন ছিল?

**আইনুন নিশাত:** সেসময় প্রকৌশলীরা জনবিচ্ছিন্ন ছিলেন। আজকেও তারা জনবিচ্ছিন্ন। তাদের কারিকুলামে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের যে প্রয়োজন আছে, বিশেষ করে পানিসম্পদ কৌশলে; কারণ আমি সেচ প্রকল্প করছি, আমি বন্যা নিয়ন্ত্রণ করছি কিন্তু জনগণের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন একটা ইন্টেলেকচুয়াল করাপশনের উদাহরণ দিই। ঢাকা থেকে আরিচা রাস্তা। সোজা ঝিটকা হয়ে চলে গেলে ২০/৩০ কিলোমিটার কম হতো। কিন্তু তখনকার মুখ্যমন্ত্রী তার বাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা নিয়ে গেলেন ধামরাই হয়ে। এখানে অনর্থক এই পথটা এখন সবাইকে পাড়ি দিতে হচ্ছে। এটার জন্য রাজনীতিবিদ যেমন দায়ী, রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও সমান দায়ী। অর্থাৎ এরা সমাজবিচ্ছিন্ন ছিলেন, আজও তাই।

আর ১৯৫৯ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ড যখন তৈরি হলো, তখন তারা যে প্রক্রিয়া বা নিয়মে চলতো, আজও তারা সেই প্রক্রিয়াই চলে। এখানে রক্ষণাবেক্ষণের কোনো ব্যাপার নেই। তাদের স্লুইসগেট কোনো কাজ করে না। তারপরও তারা নির্বিকার। এখন বাংলাদেশের সকল পেশাজীবীর মতো, প্রকৌশলীদেরও কোনো জবাবদিহি নেই। লজ্জার কথা হচ্ছে, আমি যদি এখনো সাতক্ষীরার শ্যামনগরে যাই, এখনো বন্যার পানিতে গ্রামগুলো

ডুবে যায়। অর্থাৎ জবাবদিহি নেই, স্বচ্ছতা নেই। কাজেই প্রকৌশল পেশার যদি উন্নতি করতে হয়, তাহলে ওই বিষয়গুলোতে উন্নতি আগে হতে হবে। যেটা নিয়ে আমি এখনো চিন্তা করছি যে, আমি পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মাছের কথা ভাববো না, এটা কী করে হয়? আজ পর্যন্ত পানি উন্নয়ন বোর্ডকে দিয়ে আমি এই বিষয়টার গুরুত্ব অনুধাবন করাতে পারিনি। ইঞ্জিনিয়ারদের মাথার মধ্যে একটা বিষয় ঢুকে আছে যে, একটা অবকাঠামো বানাবো। তারপর বাড়িতে গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবো। সে অবকাঠামোটা কাজ করলো কী না সেটা তো দেখতে হবে। সেটা পরিবেশ কিংবা প্রতিবেশের জন্য কতোটা কার্যকর হবে, সে চিন্তাভাবনাও নাই। এবং প্রকৌশলী প্রতিটি সংস্থা; ইদানীং একটু পরিবর্তন এসেছে রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ এবং পিডব্লিউডিতে, তারা একটু নতুন টেকনোলজির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছে। বাকি প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান হয় বিদেশিদের ওপর নির্ভরশীল অথবা অবকাঠামো নির্মাণ নিয়ে ব্যস্ত। শ্রদ্ধার সঙ্গে নাম উচ্চারণ করছি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকীর। তিনি এলজিইডিকে গণমুখী করার কাজ শুরু করেছিলেন।

**প্রশ্ন:** সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ে কেন পানি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত হলেন?

**আইনুন নিশাত:** তখন তো বুয়েটের শিক্ষকদের ভাগ করে দেয়া হতো, কে কী পড়াবেন বা পড়বেন। আমরা কয়েকজন একসঙ্গে পিএইচডি করি, বিভিন্ন বিষয়ে। যেমন শামীমুজ্জামান বসুনিয়া, তিনি স্ট্রাকচারে ছিলেন। ফিরোজ আহমেদ, তিনি এনভায়রনমেন্টে ছিলেন। শফিউল্লাহ সয়েল সায়েন্সে ছিলেন। আমরা একসঙ্গেই ছিলাম। হাইড্রোলিকসে আমি পিএইচডি করি। কিন্তু ফিরে এসে যেকোনো কারণেই হোক, আমাকে কিছু

**পানি উন্নয়ন বোর্ডের কথায় আসতে চাই। সেখানকার প্রকৌশলী যারা আছেন, তারা ক্যাপাবল। উপকূল অঞ্চলে যে সমস্ত প্রযুক্তি প্রয়োজন, সেটা আমাদের আয়ত্তে আছে। তবে, এখন যে নৌবন্দর হচ্ছে দেশের মধ্যখানে, সেটার প্রযুক্তি আমাদের নেই। কিন্তু অনেকে সাহস করছেন। সেটা তো করতেই হবে।**

কোর্স পড়াতে দেয়া হয় যেগুলো আমি নিজে কোনোদিন পড়ি নাই। আমার কিছু সিনিয়র শিক্ষক আমাকে বেকায়দায় ফেলার জন্যই হয়তো এটা করেছিলেন। তো আমিও তাদের সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে, দুই বছরের মধ্যে লাইব্রেরিতে গিয়ে, ওভারঅল যে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট; সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং আসপেক্ট, ইকোনমিক আসপেক্ট, সোশ্যাল আসপেক্ট, এনভায়রনমেন্টাল আসপেক্ট, ফাইন্যান্সিয়াল আসপেক্ট, ইনস্টিটিউশনাল আসপেক্ট, ম্যানেজমেন্ট আসপেক্ট, কমিউনিটিকে কীভাবে এনগেজ করতে হবে এবং ওয়াটার প্রজেক্ট শেষ করার পর সাব সিকোয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট-এই জিনিসগুলো আমি তখন পড়তে ও শিখতে বাধ্য হই। এবং একটা কোর্স ইন্ট্রোডিউস করে আমি পড়ানো শুরু করি। সে সময় মজার জিনিস হচ্ছে যে, এমএসসি কোর্সে বুয়েটে ২০/৩০ জন ছাত্র থাকতো। কিন্তু আমার ওই প্ল্যানিং কোর্সে ৫০/৬০ জন ছাত্র থাকতো। আমি ১৯৯৮ সালে বুয়েট ছেড়ে চলে গেলাম। তারপর সেটা পড়ানো হয়েছে কী না জানা নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে আইডবিউএফএম- তারা এই বিষয়ে কোর্স চালু করেছে। তো আমি বলবো, বুয়েট এখনো গতানুগতিক টেস্টবুকে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পড়াচ্ছে। কিন্তু এর যে আধুনিক পরিবর্তন হয়েছে বা সমাজের চাহিদা অনুযায়ী প্রকৌশলের রূপরেখা যে বদলাবে,

**পরিকল্পনা কমিশন এখনো তাকিয়ে থাকে বিদেশিদের দিকে। কিন্তু খুশির খবর হচ্ছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এখন বলা হচ্ছে যে, ৪/৫ কোটি টাকার জন্য আমরা আর বিদেশিদের দ্বারে যাবো না। এবং আমাদের লোকজনদেরকে যত পারো তত বেশি ব্যবহার করো। যখন এই নির্দেশটা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এসেছে, তখন থেকে একটু নাড়াচাড়া শুরু হয়েছে।**

সেদিকে নজর নেই। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সম্প্রতি কিছুটা শুরু করেছে বলে শুনেছি। কিন্তু অন্যান্য বিভাগ এখনো সেই পুরনো ধ্যানধারণা আঁকড়ে ধরে বসে আছে।

**প্রশ্ন:** জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমাতে আমাদের প্রকৌশলীরা কী ভূমিকা রাখতে পারেন?

**আইনুন নিশাত:** জলবায়ুর বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় বিশ্বে এমন কোনো প্রযুক্তি নেই, যা আমরা ব্যবহার করতে পারি না। ইনফ্যাক্ট ২০১৫ পর্যন্ত আমরা বিদেশিদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, তারা আমাদের রিপোর্ট তৈরি করে দেবে। এ বছর থেকে চারটা রিপোর্ট তৈরি হচ্ছে। মূল যে রিপোর্ট; জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কী করতে হবে, আমি হচ্ছি সেটার দলনেতা। অর্থাৎ বিদেশিদের বদলে সরকার আমাকে নিয়োগ দিয়েছে এবং আমরা বাংলাদেশিরা মিলে এই ডকুমেন্টস তৈরি করছি। আমাদের প্রকৌশলীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ট্রেনিংয়ের কাজও আমরা বাংলাদেশিরাই করছি। আমাদের দেশে এখনো দাতাদের আধিপত্য আছে। পরিকল্পনা কমিশন এখনো তাকিয়ে থাকে বিদেশিদের দিকে। কিন্তু খুশির খবর হচ্ছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এখন বলা হচ্ছে যে, ৪/৫ কোটি টাকার জন্য আমরা আর বিদেশিদের দ্বারে যাবো না। আমাদের লোকজনদেরকে যত পারো তত বেশি ব্যবহার করো। যখন এই নির্দেশটা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এসেছে, তখন থেকে একটু নাড়াচাড়া শুরু হয়েছে।

**প্রশ্ন:** তার মানে কী আমরা শতভাগ সক্ষম?

**আইনুন নিশাত:** না, শতভাগ সক্ষম কোনো দেশই না। কারণ, প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। চীনকেও আমেরিকার সাহায্য নিতে হয়, ইংল্যান্ডকে জার্মানির সাহায্য নিতে হয়। তবে, প্রযুক্তি হস্তান্তরে আমাদেরকে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। দুটো কারণে বিদেশিদের প্রয়োজন হতে পারে। এক. প্রযুক্তিটা অত্যন্ত জটিল যে বিষয়ে আমাদের আগের কোনো ধারণা নেই। দুই. প্রযুক্তি নতুন, তার সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হবে।

**প্রশ্ন:** উপকূলীয় সাইক্লোন শেল্টার তৈরির মাস্টারপ্ল্যানে আপনি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এই উদ্যোগ বাংলাদেশের মানুষকে কতোটা সুরক্ষিত করেছে?

**আইনুন নিশাত:** আবারো পানি উন্নয়ন বোর্ডের কথায় আসতে চাই। সেখানকার প্রকৌশলী যারা আছেন, তারা ক্যাপাবল। উপকূল অঞ্চলে যে সমস্ত প্রযুক্তি প্রয়োজন সেটা আমাদের আয়ত্তে আছে। তবে, এখন যে নৌবন্দর হচ্ছে দেশের মধ্যখানে, সেটার প্রযুক্তি আমাদের নেই। কিন্তু অনেকে সাহস করছেন। সেটা তো করতেই হবে। যেমন হল্যান্ডের পানি প্রযুক্তির মাস্টারপ্ল্যান কিন্তু তৈরি করেছেন আমেরিকানরা। আমাদের মাস্টারপ্ল্যান যদি কেউ করে দেয়, ভালো কথা। কিন্তু কী করে দিলো, সেটা বুঝে নেয়ার দক্ষতা থাকতে হবে। সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো প্রশাসক এবং

প্রকৌশলীদের। এই মাস্টারপ্ল্যান রেডক্রস শুরু করে। তার আগে পিডব্লিউডি শুরু করে। কিন্তু যে মাস্টারপ্ল্যানের ভিত্তিতে কাজ চলছে, সেটা ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে অন্য যারা কাজ করেন, তাদের মধ্যে আমি, প্রফেসর শফিউল্লাহ, শামীমুজ্জামান বসুনিয়া অন্যতম। প্রজেক্টটা আসলে আমাদেরই তৈরি করা। আর উপকারভোগী তো অসংখ্য।

**প্রশ্ন:** গেলো ৫০ বছরে পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সার্বিক অগ্রগতিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

**আইনুন নিশাত:** আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকৌশলবিষয়ক যেসব প্রতিষ্ঠান আছে, তারা এখনো বিষয়টিকে ততোটা গুরুত্ব দেয়নি। কর্মকান্ড আমলে এনে পরিকল্পনা সাজায়নি। বাইরে থেকে আমরা যারা কাজ করি, চেষ্টা করছি। প্রশাসক মহল উন্নতি করতে এখন আন্তরিক। বরং প্রকৌশলীরাই পিছিয়ে আছে। অবিলম্বে এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আসলে তেমন কিছুই তো হয়নি আমাদের। বর্তমানে সারাদেশে জলবায়ুসংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দিচ্ছে দেশিয় প্রতিষ্ঠান সিইজিআইএস। আর অভিযোজনের যে মহাপরিকল্পনা হচ্ছে সেটার নেতৃত্বে আমি এবং সঙ্গে বেশ কিছু প্রকৌশলী। অর্থাৎ আমাদের এখানে সাহেব কোনো কনসালট্যান্ট নাই। বাংলাদেশি কিছু এক্সপার্ট যারা কানাডা কিংবা অন্যান্য দেশে থাকে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, যদি দরকার পড়ে, তাহলে তাদের পরামর্শ আমরা কিছুটা নেবো।

**প্রশ্ন:** আমাদের দেশের বহু নদী তো মরে যাচ্ছে। এর পেছনে কারণ কী?

**আইনুন নিশাত:** প্রথমত এগুলো বাঁচাতে পানি উন্নয়ন বোর্ড কোনো প্রচেষ্টা নেয়নি। ড্রেজিংয়ের নামে হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। এটার মধ্যে বিআইডব্লিউটিএ এবং পাউবোর ইঞ্জিনিয়াররা আছেন। যাদের নদীবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। একটা নদী শুধু পানি ক্যারি করে না, তার সঙ্গে স্যাডিমেন্ট ক্যারি করে। এটার ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের ১০/১২ জন প্রকৌশলী ছাড়া অন্য কেউ জানেন বলে মনে হয় না। এবং নদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে না, শুকানো হচ্ছে। আপনি যদি উত্তরবঙ্গে যান, দেখবেন মেশিন দিয়ে পানি তুলে ধানক্ষেতে দেয়া হচ্ছে। এই কাজটি করছে

**আমি লক্ষ করেছি, আমাদের তরুণরা দ্রুত পিকআপ করতে পারে। তারা স্বশিক্ষিত। ইউনিভার্সিটি যতোটা শিখিয়েছে, তার চেয়ে বেশি তারা শিখছে নিজে নিজে। সিভিল, মেকানিক্যাল, নেভাল সবখানেই তরুণদের বড় একটা অংশ দারুণভাবে এগোচ্ছে। যারা বিদেশে চলে যেতে পেরেছে, সেখানে তারা সুনাম অর্জন করছে। আমি তাদের জন্য গর্বিত।**

বিএডিসি অথবা প্রাইভেট সেক্টর। অর্থাৎ নদীকে রক্ষায় কিছু প্রতিষ্ঠান কাজ করলেও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে বলে মনে হয় না। তারা রাজনৈতিক প্রভুদের তোষামোদে ব্যস্ত থাকে। অনেকে নদী দখল করছে, আমি তো সেই কর্মকাণ্ডে বহু প্রকৌশলীকেও দায়ী করবো।

**প্রশ্ন:** নদীশাসন এই মুহূর্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটা কতোটা জটিল?

**আইনুন নিশাত:** যমুনাতে নদীশাসন যখন শুরু হয়, তখন বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিদেশি প্রকৌশলীরা আসে। কিন্তু সেখানে প্যানেল অব এক্সপার্টে ছিলেন জামিলুর রেজা চৌধুরী এবং আমি। আমরা তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, আমাদের নদীটার ধর্ম কী রকম। তারা হল্যান্ডে গিয়ে সেটার ওপরে মডেল করে, নদীগুলোকে বুঝে প্রকল্প করেছে।

আর পদ্মা সেতুটা ইউনিক। এ ধরনের নদী পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। আমরা তাদের সঙ্গে নিয়মিত বসে, গাইড করেছি এবং করছি। আসলে এমন প্রকল্প ভবিষ্যতেও হয়তো একটা দুইটার বেশি হবে না। পদ্মা সেতুর ডিজাইন কিন্তু হয়ে গেছে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যখন সংযুক্ত ছিল। এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ছিল যে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থাকার সময় প্রকল্পে যেভাবে কোয়ালিটি কন্ট্রোল মেজারমেন্ট ছিল, সেটা যেন থাকে। আমাদের দেশে এই বিষয়টা খুব দুর্বল। জনসাধারণের সম্পৃক্ততা দুর্বল। জবাবদিহি বলে

**যমুনাতে নদীশাসন যখন শুরু হয়, তখন বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিদেশি প্রকৌশলীরা আসে। কিন্তু সেখানে প্যানেল অব এক্সপার্টে ছিলেন জামিলুর রেজা চৌধুরী এবং আমি। আমরা তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে আমাদের নদীটার ধর্ম কী রকম। তারা হল্যান্ডে গিয়ে সেটার ওপরে মডেল করে, নদীগুলোকে বুঝে প্রকল্প করেছে।**

কিছুই নাই। বিদেশিদের সঙ্গে থেকে কিছু শিখেছি। যে কারণে আমাদের কথাবার্তা দেশিয় ইঞ্জিনিয়ারদের খুব একটা ভালো লাগে না।

**প্রশ্ন:** এই অভিজ্ঞতা সামনে আমাদের কাজে দেবে কী না?

**আইনুন নিশাত:** আগে ছোট প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ঠিক করা জরুরি। এখনো কেন ছোট প্রকল্পে বিদেশি পরামর্শক আনা হয়? আমরা তো ঠিকমতো কাজও করি না। কারণ আমাদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, দক্ষতা এবং জনসম্পৃক্ততা নাই। এটা না করতে পারলে ইঞ্জিনিয়াররা চিরকালই কথা শুনবে।

**প্রশ্ন:** তরুণ প্রকৌশলীদের নিয়ে কতোটা আশাবাদী?

**আইনুন নিশাত:** অত্যন্ত আশাবাদী। আমি লক্ষ করেছি, আমাদের তরুণরা দ্রুত পিকআপ করতে পারে। তারা স্বশিক্ষিত। ইউনিভার্সিটি যতোটা শিখিয়েছে, তার চেয়ে বেশি তারা শিখছে নিজে নিজে। সিভিল, মেকানিক্যাল, নেভাল সবখানেই তরুণদের একটা বড় একটা অংশ দারুণভাবে এগোচ্ছে। যারা বিদেশে চলে যেতে পেরেছে, সেখানে তারা সুনাম অর্জন করছে। আমি তাদের জন্য গর্বিত। কিছু তো গতানুগতিক থাকবেই।

**প্রশ্ন:** আগামীর উন্নয়নে তাদের অবদান রাখার সুযোগ কোথায়?

**আইনুন নিশাত:** অবদান রাখার সুযোগ তো অবারিত। কিন্তু দেখেন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়াররা কোথায় এখানে? এখনো গ্রামে যখন রাস্তা বানাই, বৃষ্টিতে ধুয়ে চলে যায়। কোয়ালিটি কন্ট্রোল কোথায়? কাজেই অনেক দূর যেতে হবে। বিদেশে গিয়ে কেউ কেউ ভালো করবে বলে আমরা খুশি থাকবো, সেটা না। দেশের ভেতরে যারা থেকে গেলাম তাদের কী হবে? আসলে দেশের সিস্টেমটা আমাদের ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। যে কারণে আমাদের ভালো ছেলেরা অ্যাডমিন ক্যাডারে চলে যাচ্ছে। সেখানে কিন্তু ভালো করছে।

কিন্তু প্রকৌশল ক্যাডারে যারা আছে তারা অনেকটা হতাশ, কারণ অ্যাডমিনের অধীনস্ত হয়ে গেছে। এজন্য আগের প্রকৌশলীরাও দায়ী। কারণ, তারা ঠিকমতো অবকাঠামো গড়ে তোলেননি। এখন আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।

# ছবির অ্যালবাম

## ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
### ঢাকা কেন্দ্র

# চিত্রে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের কর্মকান্ডসমূহ

## আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা

## আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র নব-নির্বাচিত কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ

## বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

## প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা

## Plenary Session

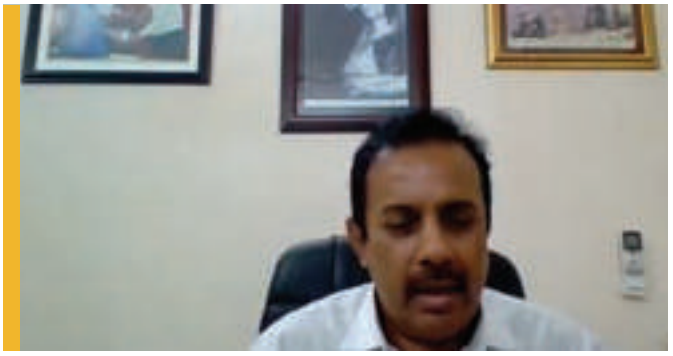

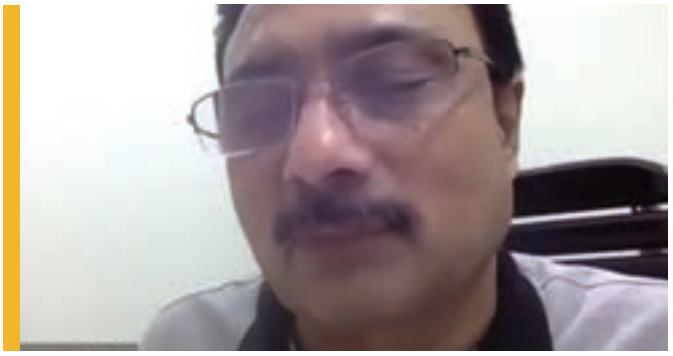

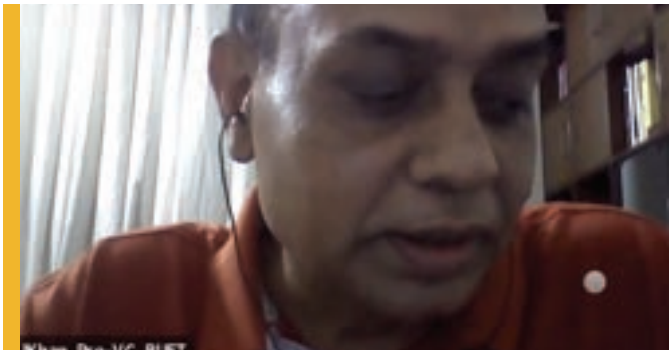

## বিশ্ব নগর দিবস উপলক্ষে কারিগরী আলোচনা সভা

## আইইবি প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নুরুল হুদা ও সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর এর আরোগ্য কামনায় দোয়া মাহ্‌ফিল

## মাস্ক বিতরণ কর্মসূচী

## টাঙ্গাইল উপকেন্দ্রের বার্ষিক সাধারণ সভা ও মাস্ক বিতরণ

## ভাস্কর্য বিরোধিতা ও উগ্র মৌলবাদের প্রতিবাদে মানববন্ধন

## Collaborative Meeting between IEB, Dhaka Centre and Google

## মহান বিজয় দিবস - ২০২০

# মহান বিজয় দিবস-২০২০ উপলক্ষে আলোচনা সভা

## মহান বিজয় দিবস-২০২০ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

## মরহুম প্রকৌশলী এ.কে.এম. মোস্তাফিজুর রহমান স্মরণে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল

## Inaugural session of training on "Project Management [PMI Framework] Primavera & Pert Master"

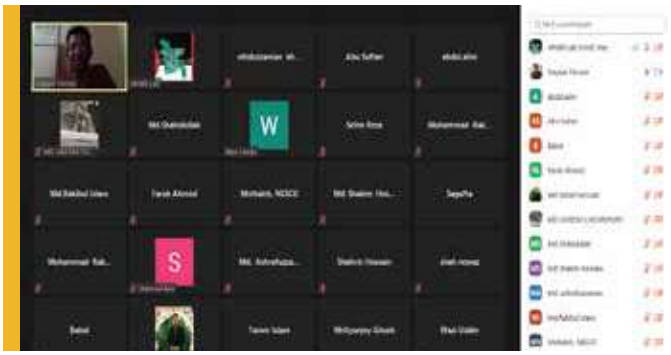

## Concluding Session of Training on "Project Management (PMI Framework) Primavera & Pert Master"

# বিভিন্ন কমিটির সভাসমূহ

## আপ্যায়ন কমিটি

## টেস্টিং ল্যাব প্রতিষ্ঠা সম্পর্কীয় কমিটি

## মতবিনিময় সভা

## বিজয় দিবস সংখ্যা সম্পাদনা পরিষদের সভা

## ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা

## আইসিটি বিষয়ক সভা

## অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কমিটির সভা

## ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা

## ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কমিটির সভা

## ৪৪৯তম কাউন্সিল সভা

## ৪৫০তম কাউন্সিল সভা

## দুস্থ ও শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

## বিবিধ

# স্মরণে

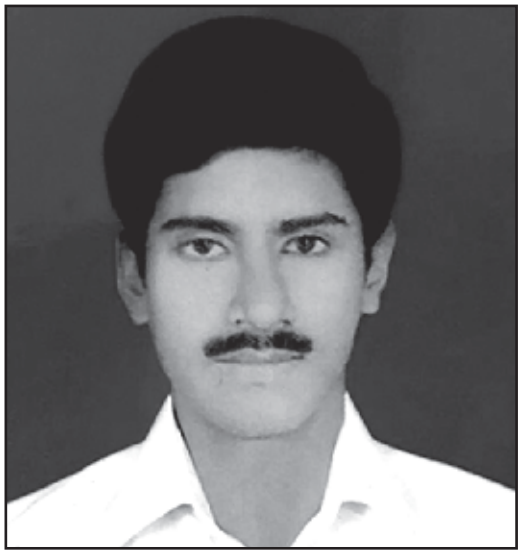

**মরহুম প্রকৌশলী এ. কে. এম. মোস্তাফিজুর রহমান**, এফ/২১৬১
(১৯৫৩-২০২০)

মরহুম প্রকৌশলী এ. কে. এম. মোস্তাফিজুর রহমান ১৯৮৮-৮৯ মেয়াদে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পেশাগত দক্ষতা ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে তিনি দেশ গঠনে কাজ করে গেছেন নিরলসভাবে। প্রকৌশলীদের সুখ-দুঃখে তিনি সবসময় পাশে থেকেছেন। আজীবন কাজ করে গেছেন প্রকৌশলীদের কল্যাণে। তিনি ২৬ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র নির্বাহী কমিটি ও কাউন্সিল গভীর শোক প্রকাশ ও বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছে।

# বিজ্ঞাপন

Shun Shing Group

www.sevenringscement.com
SevenRingsCement

# YOUR HOME
# YOUR FUTURE
## BUILD YOUR HOME WITH
# FIRM FOUNDATION

Unparalleled quality, world-class raw materials and 3 decades of service have formed the foundation of our customer-reliability. With that reliability we are building the firm future for countless customers.

SEVEN RINGS CEMENT

FOUNDATION FOR FUTURE

BBS Cables
Environment Friendly Cables

# BBS CABLES®
more than safety

## EMERGING TO THE NEW HORIZON

### CDCC LINE FOR HIGH VOLTAGE (HV), EXTRA HIGH VOLTAGE (EHV) CABLE (UP TO 245 kV).

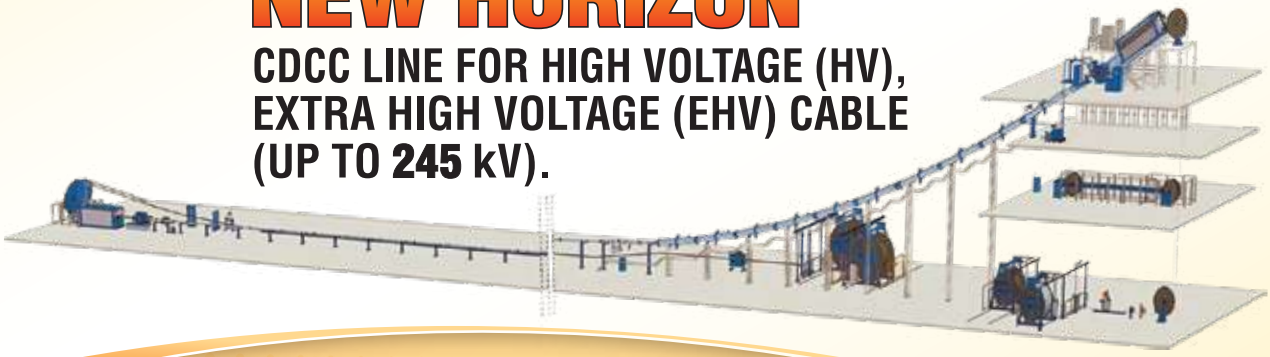

## BASIC ADVANTAGE OF CDCC LINE

- THIS CDCC LINE IS FROM (TROESTER, GERMANY) OF WHICH PRODUCTION CAPACITY IS UP TO 245 kV.
- LONG PRODUCTION LENGTH.
- PERFECT CONCENTRICITY AND ROUNDNESS THROUGH TWNROT AND TROSS.
- EXCELLENT CORE TOLERANCE FOR HV/EHV/MV CABLES.
- EXTRUDER CONTROL IS VIA MODULAR AUTOMATION SYSTEM.
- COMPUTER DISTRIBUTION FLOW CHANNEL.
- COMPUTER OPTIMIZED MATERIAL FLOW CHANNELS.
- TYPICALLY THE LINE CONTROL CONSISTS OF PLC-PC ARCHITECTURE.

বিবিএস কেবলস্ অর্জন করলো এশিয়ার
**সর্বশ্রেষ্ঠ ব্র্যান্ড**
এর সম্মাননা

ক্যাটাগরিঃ কেবলস্
ইন্ডাস্ট্রিঃ ম্যানুফ্যাকচারিং

কর্পোরেট অফিসঃ
কনফিগার ব্যাপারী টাওয়ার (৪র্থ তলা), গ-৬৪, প্রগতি সরণি, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা ১২১২
ফোন: +৮৮ ০২ ২২২২৯৪৭৭১, +৮৮ ০২ ২২২২৯৫৯১৫ ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ২২২২৬০৭৭২
info@bbscables.com.bd www.bbscables.com.bd /bbscablesltd
+৮৮ ০১৭৫৫৫৯৭৭২৭

Reg. Office : 31, Tejturi Bazar Chak, Indira Road, Farmgate Dhaka – 1212.
Branch Office: Lab: 298, (5th Floor) Shadinota Sharani, Uttara Badda, Badda, Dhaka – 1212.
Cell : 01814-382313, 01619110030, E-mail: engr.scmasum@gmail.com

# আইইবি'র
# সকল প্রকৌশলী সদস্যদের
# মহান বিজয় দিবসের
# শুভেচ্ছা

## Contemporary Engineering Ltd.

Givs a visible form of you desire.

Advance Engineering Survey, Geotechnical Investigation, Consultancy & Construction,

www.bsrm.com

BSRM Xtreme B500 DWR
the tough steel

# The Steel Revolution Continues ....

In 2008 BSRM changed the reinforcing steel map of the country. It introduced the first weldable grade high-strength steel for the country's construction industry. It was the country's first Grade 500 steel and branded as **BSRM Xtreme 500W.**

Today, 12 years later, in another epochal development, BSRM celebrates the extension of the original as **BSRM Xtreme B500DWR.**

## It is the first reinforcing steel in the country with 7 unique features:

- A guaranteed Tensile strength to Yield strength ratio at least equal to or greater than 1.25.
- This ***magic*** ratio of T/Y: 1.25 in steel is the most sought after property by veteran civil engineers and designers of high rise structures. It ensures ***Toughness*** of the Buildings.
- Guaranteed conformity to Carbon Equivalent ratio below 0.61 to ensure welding as per American Welding Society AWS D1.4 / D1.4 M.
- Guaranteed bending properties for easy site fabrication into shapes required in civil construction as per British Standards BS 4466.
- It fulfills all the requirements of Chapter 18 of the seismic design of Buildings of the American Concrete Institute ACI 318-19.
- It is fully compliant to Bangladesh National Building Code (BNBC) 2018.
- It is also fully compliant to BDS ISO 6935-2:2016 which is the official Reinforcing Steel standard of Bangladesh.

ISO | AWS American Welding Society | BSI British Standards | aci | BNBC

**BSRM upholds its longstanding tradition of conforming to high standards of professionalism and meticulous attention to Quality and Reliability in all its products.**

To know more, scan the QR Code.

BSRM building a safer nation

# muspana®

## Solar Solution / Street Light / LPS / Medical W. M. / Generator

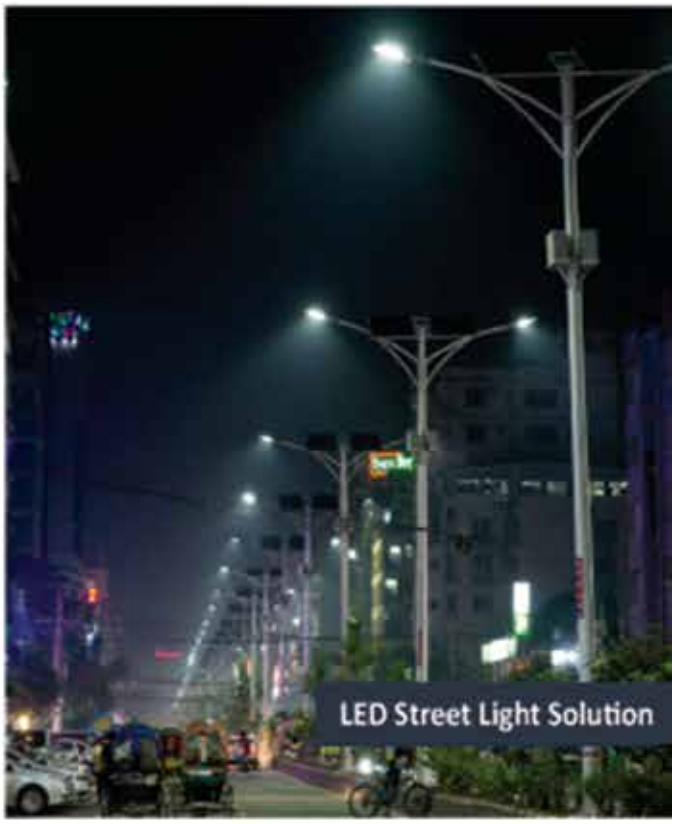

CAST RESIN TRANSFORMERS
CESI
Energypac lights up the city of Mumbai with 70 transformers, to Adani Electricity Mumbai Ltd.
adani Electricity
Head Office
Energy Center, 25 Tejgaon I/A,
Dhaka-1208, Bangladesh
Phone: +88028 87 93 95
Fax: +88028 87 93 98
marketing@energypac-bd.com
www.energypac-bd.com
Works
Baruipara, Savar
Dhaka, Bangladesh
Phone: +8801713 28 56 25
Sales Hotline Number
01777 78 11 88
crafted with pride
Energypac
Engineering
www.energypac-bd.com

# শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

## বাড়ছে বিদ্যুৎ হচ্ছে উন্নয়ন গড়ছে বাংলাদেশ

হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট, হরিপুর, নারায়ণগঞ্জ।

সিদ্ধিরগঞ্জে স্কুল ভবনের ছাদে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

সিদ্ধিরগঞ্জ ২×১২০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

## জাতীয় উন্নয়নে মানসম্মত বিদ্যুৎ উৎপাদনে ইজিসিবি লিঃ অঙ্গীকারবদ্ধ

ELECTRICITY GENERATION COMPANY OF BANGLADESH LTD.
EGCB

ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিঃ

(বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান)

ইউনিক হাইটস (লেভেল-১৫ ও ১৬), ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১২১৭।

www.egcb.com.bd: mail: info@egcb.com.bd